ভক্তিযোগ।

"স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো
জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশে অস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যতে ঈশনায় ॥
যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদান প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥"

তিনি জগন্ময়, অমর, নিয়ন্তৃ রূপে অবস্থিত, জ্ঞাতা, সর্ব্বব্যাপী, এই জগতের পালয়িতা। তিনি অনন্তকাল জগৎ শাসন করিতেছেন, এই জগৎ-শাসনের অন্য হেতু কিছু নাই। যিনি আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, করিয়া তাঁহাকে বেদ প্রদান করিয়াছিলেন, মোক্ষলাভেচ্ছায় আমি সেই স্বজ্ঞানে প্রকাশ্য দেবের শরণ লইলাম।

— শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৭, ১৮ শ্লোক।

ভক্তির লক্ষণ।

অকপট ভাবে ঈশ্বরানুসন্ধানই ভক্তি-যোগ; প্রীতি ইহার আদি, মধ্য ও সমাপ্তি। মুহূর্ত্তস্থায়ী ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ততাও শাশ্বত মুক্তির প্রসূতি। নারদ তদীয় ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন, "ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি।" "জীব এতল্লাভে সর্ব্বভূতে প্রেমবান্ ও ঘৃণাশূন্য হয় এবং অনন্তকালের জন্য তুষ্টিলাভ করে।" এবং "এই প্রেমের দ্বারা কোন কাম্যবস্তু লাভ হইতে পারে না, কারণ, বিষয় বাসনা থাকিতে উহা আসিতেই পারে না।" "ভক্তি, কর্ম্ম জ্ঞান ও যোগ হইতেও শ্রেষ্ঠতর", কারণ উহারা ফলাভিসন্ধিযুক্ত, "কিন্তু ভক্তি স্বয়ংই, সাধ্য ও সাধন-স্বরূপা"। *

অস্মদ্দেশীয় সকল মহাপুরুষই ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। শাণ্ডিল্য নারদাদি ভক্তিতত্ত্বের বিশেষ ব্যাখ্যাতা-গণকে ছাড়িয়া দিলেও, স্পষ্টতঃ জ্ঞানমার্গসমর্থনকারী ব্যাসসূত্র-ভাষ্যকার মহাপণ্ডিতগণও, ভক্তিসম্বন্ধেও অনেক ইঙ্গিত করিয়াছেন। সমুদয় না হউক, অধিকাংশ সূত্রগুলিই শুষ্ক জ্ঞানসূচক অর্থে ব্যাখ্যা করিবার আগ্রহ ভাষ্যকারগণের থাকিলেও, সূত্রগুলির,

---

* সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা।

নারদ-সূত্র—১ম অনুবাক, ২য় সূত্র।

সা ন কামযমানা নিরোধরূপাৎ।

নারদ-সূত্র—২য় অনুবাক, ৭ম সূত্র।

সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা।—ঐ, ৪র্থ অং, ২৫ সূত্র।

ফলরূপত্বাৎ। ঐ, ঐ, ২৬ সূত্র।

বিশেষতঃ উপাসনা-কাণ্ডের সূত্রগুলির, অর্থ নিরপেক্ষ ভাবে অনুসন্ধান করিলে, সহজে তাহাদের ঐরূপ যথেচ্ছ ব্যাখ্যা চলিতে পারে না।

সাধারণতঃ লোকের সংস্কার—জ্ঞান ও ভক্তি অতিশয় পৃথক্‌ বস্তু; বাস্তবিক তাহা নহে। পরে বুঝিব, সম্মিলনোন্মুখ হইতে হইতে ক্রমশঃ কিরূপে তাহাদের সম্মিলন হয়। রাজযোগের লক্ষ্যও তাহাই। ভালমানুষদের চক্ষে ধূলিপ্রক্ষেপের উদ্দেশ্যে কৃত না হইয়া (জুয়াচোর ও গুপ্তবিদ্যার নামে ছলনাকারীদের হস্তে পড়িলে, উহা ঐরূপই দাঁড়ায়) মুক্তিলাভোদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলে, উহাও সেই একই লক্ষ্যে পঁহুছিয়া দেয়।

ভক্তিযোগে এক বিশেষ সুবিধা—উহা আমাদের চরম লক্ষ্য ঈশ্বরে পঁহুছিবার, অতি সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা। কিন্তু উহাতে বিশেষ বিপদাশঙ্কা এই যে, নিম্নস্তরের ভক্তি অনেক সময়ে ভয়ানক গোঁড়ামীর আকার ধারণ করে। হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্ট ধর্ম্মানুবর্ত্তী গোঁড়ার দল, এই নিম্নস্তরের ভক্তিসাধকগণের ভিতরই প্রায় অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। যে ইষ্ট-নিষ্ঠা ব্যতীত প্রকৃত প্রেমের উৎপত্তিই অসম্ভব, অনেক সময়ে তাহা আবার, অন্য সমুদয় মতের উপর তীব্র আক্রমণ ও দোষারোপেরও কারণ। সকল ধর্ম্মের ও সকলদেশের দুর্ব্বলাধিকারী, অবিকশিতমস্তিষ্ক পুরুষগণেরই তাহাদের আদর্শ সত্যকে ভালবাসিবার একমাত্র উপায় আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সেই উপায় এই—অপর সমুদয় আদর্শে ঘৃণাপোষণ করা। নিজ ঈশ্বরাদর্শে, নিজ ধর্ম্মাদর্শে একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিগণ, অন্য কোনও আদর্শের বিষয় শুনিলে কেন নানাবিধ গোঁড়ামি করিয়া চীৎকার করিতে থাকে, তাহার কারণ ইহা হইতেই লব্ধ হয়। এরূপ প্রেম যেন—

প্রভুর বিষয়ে অপরের হস্তক্ষেপ নিবারণের কুক্কুরসুলভ সহজ প্রবৃত্তি স্বরূপ। তবে প্রভেদ এই, কুক্কুরের এই সহজ প্রবৃত্তি মানবযুক্তি হইতে শ্রেষ্ঠতর—প্রভু, যে বেশধারী হইয়া, তাহার সম্মুখে আসুন না কেন, কুক্কুর তাঁহাকে কথনই শত্রু বলিয়া ভ্রমে পড়ে না। গোঁড়া আবার সমুদয় বিচার শক্তি হারাইয়া ফেলে। তাহার চক্ষে ব্যক্তিগত বিষয় এত প্রগাঢ় চিন্তার বিষয় যে, কোন্ ব্যক্তি কি বলে, তাহা সত্য কি মিথ্যা, তাহার মতে তাহা দেখিবার কিছু প্রয়োজন নাই, কিন্তু কে উহা বলিতেছে, সেই বিষয়েই তাহার বিশেষ দৃষ্টি। যে লোক নিজ সম্প্রদায়ের—নিজের সহিত একমত ব্যক্তিগণের উপর দয়াশীল, ন্যায়পর ও প্রেমযুক্ত, সেই, দেখিবে, নিজ সম্প্রদায়ের বাহিরের লোক গুলির প্রতি না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই।

তবে এ আশঙ্কা কেবল ভক্তির নিম্নস্তরেই আছে—এই অবস্থার নাম গৌণী। উহা একটু পরিপক্ক হইয়া পরাভক্তি রূপে পরিণত হইলে, আর এরূপ ভয়ানক গোঁড়ামী আসিবার আশঙ্কা থাকে না। এই পরাভক্তিতে অভিভূত ব্যক্তি, প্রেম-স্বরূপ ভগবানের এত নিকটে পৌঁছিয়াছেন যে, তিনি আর অপরের প্রতি ঘৃণার ভাব বিস্তারের যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারেন না।

এই জীবনেই সকলেই যে সামঞ্জস্যের সহিত চরিত্র গঠন করিবে, তাহা সম্ভব নহে; তবে আমরা জানি, যে চরিত্রে জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ সমভাবে বিরাজমান, সেই চরিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চদরের। পাখীর উড়িতে তিনটী জিনিসের আবশ্যক—দুটী পক্ষ ও চালাইবার হালস্বরূপ একটী পুচ্ছ। জ্ঞান ও ভক্তি দুইটী পক্ষ, যোগ উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য পুচ্ছ স্বরূপ। যাঁহারা

এই তিনরূপ সাধন প্রণালী এক সঙ্গে, সামঞ্জস্যের সহিত অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া, ভক্তিই একমাত্র পথ-স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বাহ্য অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ প্রথম অবস্থায় সাধকের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় হইলেও, তাহাদের উপযোগিতা কেবল ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম জন্মাইয়া দেওয়া মাত্র।

জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের উপদেষ্টাগণের ভিতর একটু সামান্য মতভেদ আছে, যদিচ উভয়েই ভক্তির প্রভাবে বিশ্বাসী। জ্ঞানীরা ভক্তিকে মুক্তির উপায় মাত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, কিন্তু ভক্তেরা উহাকে উপায় ও উদ্দেশ্য উভয়ই বলিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, এ প্রভেদ কেবল নামমাত্র। প্রকৃতপক্ষে, ভক্তিকে সাধনস্বরূপ বলিলে নিম্নস্তরের উপাসনামাত্র বুঝায়। আর এই নিম্নস্তরের উপাসনাই একটু অগ্রসর হইলে, উচ্চস্তরের ভক্তির সহিত অভেদভাব ধারণ করে। সকলেরই বোধ হয়, যেন নিজ নিজ সাধনপ্রণালীর উপর ঝোঁক দিতেছেন। 'পূর্ণ ভক্তির উদয়ে, প্রকৃত জ্ঞান অযাচিত হইলেও আসিবেই আসিবে, আর পূর্ণ জ্ঞানের সহিত প্রকৃত ভক্তিও অভিন্ন,' এ সত্য তাঁহারা যেন ভুলিয়া গিয়াছেন।

এইটা মনে রাখিয়া, এ বিষয়ে পূজনীয় বেদান্তভাষ্যকারেরা কি বলিয়াছেন, দেখা যাউক। 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' এই সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভগবান্ শঙ্কর বলেন ;—"লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে,—অমুক রাজার ভক্ত, অমুক গুরুর ভক্ত। যে, গুরুর নির্দেশানুবর্ত্তী হয় ও তাঁহাকেই একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করে, তাহাকেই গুরুভক্ত বলে। আরও এইরূপ লোকে বলিয়া থাকে,—'পতিপ্রাণা স্ত্রী পতি ধ্যান করিতেছে।' এখানেও

একরূপ সাগ্রহ, অবিচ্ছেদ স্মৃতিই লক্ষিত হইয়াছে।" শঙ্করের মতে ইহাই ভক্তি। *

আবার ভগবান্ রামানুজ 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ;—

"এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে নিক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় প্রবাহিত ধ্যেয় বস্তুর নিরন্তর স্মরণের নাম ধ্যান। যখন এইরূপ ভগবৎ-স্মৃতির অবস্থা লব্ধ হয়, তখন সকল বন্ধন নাশ হয়। শাস্ত্রেও এই নিরন্তর স্মরণকে মুক্তির কারণ বলিয়াছেন। এই স্মৃতি আবার দর্শনের সহিত অভেদ। কারণ, এই শাস্ত্রোক্ত-বাক্য পাওয়া যায় যে, 'সেই পর ও অবর (দূর ও সন্নিহিত) পুরুষকে দেখিলে হৃদয়গ্রন্থি নাশ হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় ও কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়।' (যিনি সন্নিহিত, তাঁহাকে দেখা যাইতে পারে, কিন্তু যিনি দূরবর্ত্তী, তাঁহাকে কেবল স্মরণমাত্র করা যাইতে পারে। তথাপি শাস্ত্র আমাদিগকে সন্নিহিত ও দূরস্থ উভয়কেই দেখিতে বলিতেছেন, সুতরাং ঐ রূপ স্মরণ ও দর্শন সমকার্য্যকর সূচিত হইল।) "এই স্মৃতি প্রগাঢ় হইলে দর্শনের তুল্য হইয়া পড়ে। * * * আর উপাসনা অর্থে সর্ব্বদা স্মরণ, ইহা শাস্ত্রের প্রধান প্রধান শ্লোক হইতেই দৃষ্ট হয়। জ্ঞান—যাহা নিরন্তর উপাসনার সহিত অভেদ, তাহাও নিরন্তর স্মরণ অর্থে ব্যাখ্যাত

---

* তথা হি লোকে গুরুমুপাস্তে রাজানমুপাস্তে ইতি চ যস্তাৎপর্য্যেণ গুর্ব্বাদীননুবর্ত্ততে স এবমুচ্যতে। তথা ধ্যায়তি প্রোষিতনাথা পতিমিতি যা নিরন্তরস্মরণা পতিং প্রতি সোৎকণ্ঠা সৈবমভিধীয়তে।—বেদান্ত সূত্র। ৪র্থ অধ্যায়,১ম পাদ, ১ম সূত্র, শাঙ্করভাষ্য।

[illegible]। *** সুতরাং স্মৃতি যখন প্রত্যক্ষানুভূতির আকার ধারণ করে, তাহাই শাস্ত্রে মুক্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। 'নানাবিধ বিদ্যা দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, কিম্বা বহুবার বেদাধ্যয়নের দ্বারা আত্মা লভ্য নহেন। যাঁহাকে এই আত্মা বরণ করেন, তিনিই সেই আত্মাকে লাভ করেন। তাঁহার নিকটেই আত্মা আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন।' এস্থলে প্রথমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মা লব্ধ হন না বলিয়া পরে বলিতেছেন, আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহার দ্বারাই আত্মা লব্ধ হন। অত্যন্ত প্রিয়কেই 'বরণ' করা সম্ভব। যিনি আত্মাকে অতিশয় ভালবাসেন, আত্মা তাঁহাকেই অতিশয় ভাল বাসিবেন। এই প্রিয় ব্যক্তি যাহাতে আত্মাকে লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাকে সাহায্য করেন। কারণ, ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, 'যাহারা আমাতে নিরন্তর আসক্ত ও আমাকে প্রেমের সহিত উপাসনা করে, আমি তাহাদিগের বুদ্ধি এমন ভাবে চালিত করি, যাহাতে তাহারা আমাকে লাভ করে।' অতএব কথিত হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ অনুভবাত্মক এই স্মৃতি যাঁহার অতি প্রিয়, (উহা ঐ স্মৃতির বিষয়ীভূত পুরুষের অতি প্রিয় বলিয়া) তাঁহাকেই সেই পরমাত্মা বরণ করেন, তাঁহার দ্বারাই সেই পরমাত্মা লব্ধ হন। এই নিরন্তর স্মরণ 'ভক্তি' শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে।" *

* ধ্যানং চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নস্মৃতিসন্তানরূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ "স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ" ইতি ধ্রুবায়াঃ স্মৃতের অপবর্গোপায়ত্বশ্রবণাৎ। সা চ স্মৃতির্দর্শনসমানাকারা "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ এবং চ সতি "আত্মা বারে দ্রষ্টব্য"

পতঞ্জলির 'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা' সূত্রটীর ব্যাখ্যায় ভোজ বলেন, "প্রণিধান অর্থে সেইরূপ ভক্তি, যাহাতে সমুদয় ফলাকাঙ্ক্ষা (যেমন ইন্দ্রিয়ের ভোগাদি) ত্যক্ত হইয়া, সমুদয় কর্ম্ম সেই গুরুর

ইত্যনেন নিদিধ্যাসনস্য দর্শনরূপতা বিধীয়তে। ভবতি চ স্মৃতে-ভাবপ্রকর্ষাদ্দর্শনরূপতা। বাক্যকারেণৈ তৎসর্ব্বং প্রপঞ্চিতম্।

"বেদনমুপাসনম্ স্যাৎ তদ্বিষয়ে শ্রবণাদিতি।
সর্ব্বাস্বুপনিষৎসু মোক্ষ সাধনতয়া বিহিতং।

বেদনমুপাসনমি" ত্যুক্তং "সকৃৎ প্রত্যয়ং কুর্য্যাচ্ছব্দার্থস্য কৃতত্বাৎপ্রয়াজাদিবদিতি" পূর্ব্বপক্ষং কৃত্বা "সিদ্ধং তূপাসন শব্দাদিতি" বেদনমসকৃদাবৃত্তং মোক্ষ সাধনমিতি নির্ণীতম্। উপাসনং স্যাদ্ ধ্রুবানুস্মৃতি দর্শনান্নির্বচনাচ্চেতি তস্যৈব বেদনস্যোপাসনরূপস্যাসকৃদাবৃত্তস্য ধ্রুবানুস্মৃতিত্বমুপবর্ণিতম্। সেয়ং স্মৃতির্দর্শনরূপা প্রতিপাদিতা, দর্শনরূপতা চ প্রত্যক্ষতাপত্তিঃ, এবং প্রত্যক্ষতা-পন্নামপবর্গসাধনভূতাং স্মৃতিং বিশিনষ্টি "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বামি" তি অনেন কেবলশ্রবণমনননিদিধ্যাসনানামাত্মপ্রাপ্ত্যনুপায়ত্বমুক্ত্বা "যমেবৈষ আত্মা বৃণুতে তেনৈব লভ্য" ইত্যুক্তম্। প্রিয়তম এব হি বরণীয়ো ভবতি যস্যায়ং নিরতিশয় প্রিয়ঃ স এবাস্য প্রিয়তমো ভবতি। যথায়ং প্রিয়তম আত্মানং প্রাপ্নোতি, তথা স্বয়মেব ভগবান প্রযতত ইতি ভগবতৈবোক্তং "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বক দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" ইতি "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়" ইতি চ। অতঃ সাক্ষাৎকাররূপা স্মৃতিঃ, স্মর্য্যমাণাত্যর্থপ্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যত্যর্থপ্রিয়া য

গুরুর উপর সমর্পিত হয়।"* আবার ভগবান্ ব্যাস উহার ব্যাখ্যায় বলেন, "প্রণিধান অর্থে ভক্তিবিশেষ, যদ্দ্বারা যোগীর নিকট সেই পরম পুরুষের কৃপা আবির্ভাব হয় ও তাঁহার বাসনা সকল পূরণ করে।" † শাণ্ডিল্যের মতে 'ঈশ্বরে পরমানুরক্তিই ভক্তি'। ‡ ভক্তরাজ প্রহ্লাদ কিন্তু ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন বোধ হয়।—'অজ্ঞ লোকদের ইন্দ্রিয় বিষয়ে যে রূপ মহান্ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, তোমারে স্মরণ করিতে করিতে যেন আমার হৃদয় হইতে তোমার প্রতি সেইরূপ তীব্র আসক্তি অপসারিত না হয়।'§ আসক্তি—কাহার

স এব পরমাত্মনা বরণীয়ো ভবতীতি তেনৈব লভ্যতে পরমাত্মেত্যুক্তং ভবতি, এবং রূপা ধ্রুবানুস্মৃতি রেব ভক্তি শব্দে নাভিধীয়তে।

—বেদান্ত সূত্র, রামানুজ ভাষ্যে—১ম সূত্রের ভাষ্য।

* প্রণিধানং তত্র ভক্তিবিশেষোবিশিষ্ট
মুপাসনং সর্ব্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং
বিষয়সুখাদিকম্ ফলমনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ পরমগুরাবর্পয়তি—পাতঞ্জল দর্শন, ২৩শ সূত্রের ভোজবৃত্তি।

† 'প্রণিধানাদ্ভক্তিবিশেষাদাবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্ণাত্যভিধ্যান মাত্রেণ'—ইত্যাদি। পাতঞ্জলদর্শন, প্রথম অধ্যায়, সমাধি পাদ, ২৩ সূত্র ব্যাসভাষ্য।

‡ সা পরানুরক্তিরীশ্বরে—শাণ্ডিল্যসূত্র, ১ আঃ ১ম সূঃ।

§ যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু।

বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ, ২০, অধ্যায়, ১৯ শ্লোক।

জন্য? পরম প্রভু ঈশ্বরের জন্য। আর কোন পুরুষের (তিনি যত বড়ই হউন না কেন) প্রতি আসক্তি কখনই 'ভক্তি' হইতে পারে না। কারণ, রামানুজ শ্রীভাষ্যে এক প্রাচীন আচার্য্যের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা,—"ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র তৃণ পর্য্যন্ত জগদন্তর্গত সকল প্রাণী, কর্ম্মহেতু জন্ম ও মৃত্যুর বশীভূত। তাহারা অজ্ঞানসীমান্তর্ব্বর্ত্তী ও পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া সাধকের ধ্যানের সহায় নহে।"* শাণ্ডিল্যসূত্রস্থ "অনুরক্তি" শব্দ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ব্যাখ্যাকার স্বপ্নেশ্বর বলেন, উহার অর্থ—অনু—পশ্চাৎ, ও রক্তি—আসক্তি অর্থাৎ 'ভগবানের স্বরূপ ও মহিমা জ্ঞানের পর তাহার প্রতি যে আসক্তি আইসে।' † তাহা না হইলে যে কোন ব্যক্তি অর্থাৎ স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি অন্ধ আসক্তিও ভক্তি হইয়া যায়। অতএব, আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, সাধারণ পূজা পাঠাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরাগাখ্য আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য চেষ্টা পরম্পরার নাম ভক্তি।

---

* আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তা জগদন্তর্ব্যবস্থিতাঃ।
প্রাণিনঃ কর্ম্মজনিতসংসারবশবর্ত্তিনঃ॥
যতস্ততো ন তে ধ্যানে ধ্যানিনামুপকারকাঃ।
অবিদ্যান্তর্গতাঃ সর্ব্বে তে হি সংসারগোচরাঃ॥

† ভগবন্মহিমাদিজ্ঞানাদনু পশ্চাজ্জায়মানত্বাদনুরক্তিরিত্যুক্তং।
—শাণ্ডিল্যসূত্র ১ম আহ্নিক, ১ম সূত্র। স্বপ্নেশ্বরটীকা।

ঈশ্বর কে?

ঈশ্বর কে?—"যাঁহা হইতে জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হইতেছে"*। তিনি ঈশ্বর—"অনন্ত, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, পরমকারুণিক, গুরুর গুরু"। আরও সকলের উপর "তিনি অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ" †।

এইগুলি অবশ্য সগুণ ঈশ্বরের সংজ্ঞা। তবে কি ঈশ্বর দুইটী? জ্ঞানী "নেতি নেতি" করিয়া যে সচ্চিদানন্দে উপনীত হন, সেইটী একটী; ও ভক্তের প্রেমময় ভগবান্ আর একটী? না, সেই একই সচ্চিদানন্দ—প্রেমময় ভগবানও বটেন, তিনি সগুণ নির্গুণ উভয়ই। সর্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক, ভক্তের উপাস্য সগুণ ঈশ্বর ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক্ নহেন। সবই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম। তবে ব্রহ্মের এই নির্গুণ স্বরূপ অতিসূক্ষ্ম বলিয়া প্রেম বা উপাসনার যোগ্য নহে। এই কারণে ভক্ত ব্রহ্মের সগুণ ভাব অর্থাৎ পরম নিয়ন্তা ঈশ্বরকেই উপাস্যরূপে স্থির করেন। একটী উপমার দ্বারা বুঝা যাউক—

ব্রহ্ম যেন মৃত্তিকা বা উপাদান—তাহা হইতে অনেক বস্তু নির্ম্মিত হইয়াছে। মৃত্তিকারূপে তাহারা এক বটে; কিন্তু রূপ বা প্রকাশ, উহাদিগকে পৃথক্ করিয়াছে। উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহারা ঐ মৃত্তিকাতেই সূক্ষ্মভাবে ছিল। উপাদান হিসাবে তাহারা এক, কিন্তু যখন উহারা বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করে, আর যতদিন সেই রূপ থাকে, তত দিন তাহারা পৃথক্ পৃথক্। মাটীর ইঁদুর

---

* জন্মাদ্যস্য যতঃ।

—ব্রহ্মসূত্র, ১ম অধ্যায়, ১ম পাদ, ২য় সূত্র।

† স ঈশ্বর অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপঃ।

কখন মাটীর হাতী হইতে পারে না। কারণ, কোন বিশেষ গঠন রূপে সেই আকৃতিই অবশ্য তাহাদের বিশেষ অবস্থার প্রকাশক; নির্দ্দিষ্ট কোন আকৃতিশূন্য মৃত্তিকা হিসাবে অবশ্য উহারা এক। ঈশ্বর সেই পূর্ণ সত্যস্বরূপের উচ্চতম প্রকাশ। অথবা মনুষ্যমন দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বোচ্চ উপলব্ধি। সৃষ্টি অনাদি—ঈশ্বরও অনাদি।

বেদান্তসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থ পাদে মুক্তাত্মার মুক্তিলাভের পর যে একরূপ অনন্ত শক্তি ও জ্ঞান আইসে, তাহা বর্ণনা করিয়া ব্যাস আর এক সূত্রে বলিতেছেন, 'কিন্তু কেহই, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের শক্তি, লাভ করিবেন না,' কারণ, তাহা কেবল ঈশ্বরের।* এই সূত্র ব্যাখ্যার সময় দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণ পরতন্ত্র জীবের পক্ষে ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ও পূর্ণ স্বতন্ত্রতা লাভ করা যে অসম্ভব, তাহা অনায়াসে দেখাইতে পারেন। পূর্ণ দ্বৈতবাদী ভাষ্যকার মধ্বাচার্য্য বরাহপুরাণ হইতে একটী শ্লোক তুলিয়া তাঁহার প্রিয় সংক্ষিপ্ত উপায়ে এই সূত্রটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া রামানুজ বলেন, "সংশয় উপস্থিত হয় যে, মুক্তাত্মাদিগের শক্তির মধ্যে পরম পুরুষের শক্তি অর্থাৎ জগৎসৃষ্টি আদি অন্তর্ভুক্ত? অথবা পরম পুরুষের সাক্ষাৎ দর্শনই তাঁহার ঐশ্বর্য্য? এই সংশয় উপস্থিত হইলে পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হয় যে, মুক্তাত্মা জগতের নিয়ন্তৃত্ব লাভ করেন, ইহা যুক্তিযুক্ত; কারণ, শাস্ত্র বলিতেছেন, তিনি সেই শুদ্ধস্বরূপের সহিত পরম একত্ব লাভ করেন। আরও শাস্ত্র বলেন, "তিনি পরম পুরুষের

---

* জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ।

ব্রহ্মসূত্র। ৪র্থ অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ১৭শ সূত্র।

সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন ও তাঁহার সমুদয় বাসনা পূর্ণ হয়। এক্ষণে কথা এই, পরম একত্ব ও সমুদয় বাসনার পরিপূরণ—পরম পুরুষের অসাধারণ শক্তি জগন্নিয়ন্তৃত্ব ব্যতীত হইতে পারে না। অতএব, সমুদয় বাসনার পরিপূরণ ও পরম একতা লাভ হয় বলিলেই জানিতে হইবে, মুক্তাত্মা সমুদয় জগতের নিয়ন্তৃত্ব লাভ করেন। ইহার উত্তরে বলি, মুক্তাত্মা কেবল জগন্নিয়ন্তৃত্ব ব্যতীত আর সমুদয় শক্তি লাভ করেন। জগন্নিয়মন অর্থে—মুক্তাত্মা ব্যতীত জগতের সমুদয় স্থাবর জঙ্গমের স্বরূপ, স্থিতি ও বাসনার নিয়ন্তৃত্ব। মুক্তাত্মাদিগের দৃষ্টির আবরণ—যাহা তাঁহাদিগকে ভগবানের স্বরূপ দেখিতে দেয় না তাহা চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের স্পষ্ট ব্রহ্মানুভূতি হয়। ইহা শাস্ত্রীয় এই শ্লোক হইতে প্রমাণ হয়, "যাঁহা হইতে সমুদয় বস্তু জন্মায়, যাহাতে অবস্থিতি করে এবং যাহাতে প্রলয়কালে সমুদয় প্রবেশ করে, তিনি ব্রহ্ম।" যদি এই জগন্নিয়ন্তৃত্ব মুক্তাত্মাদেরও সাধারণ গুণ হয়, তবে উদ্ধৃত শ্লোক ঈশ্বরের লক্ষণ হইতে পারে না, কারণ, তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব গুণের দ্বারা তাঁহার লক্ষণ করা হইয়াছে। অসাধারণেরই বিশেষ লক্ষণের আবশ্যক হয়। অতএব, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকসমূহে পরম পুরুষকে জগন্নিয়মনের কর্ত্তারূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, আর ঐ ঐ স্থলে মুক্তাত্মার এমন বর্ণনা নাই, যাহাতে জগন্নিয়ন্তৃত্ব তাঁহাদের উপর আরোপিত হইতে পারে। শ্লোক গুলি এই,—"বৎস, আদিতে একমেবাদ্বিতীয়ং ছিলেন। তিনি দেখিলেন ও অনুভব করিলেন, আমি বহু সৃষ্টি করিব।" "ব্রহ্মই কেবল আদিতে ছিলেন। তিনি বিবর্ত্তিত হইলেন। তিনি ক্ষত্রনামে এক সুন্দর রূপ সৃজন করিলেন। সকল দেবতাই ক্ষত্র—বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান।" "আদিতে কেবল আত্মাই ছিলেন। আর কিছুই

ামানুজ বলিতেছেন, যদি বল, ইহা সত্য নহে, কারণ বেদে ইহার
বিপরীতার্থ প্রতিপাদক অনেক শ্লোক আছে, তাহা হইলে বলিব,
তাহা নিম্নদেবলোকে মুক্তাত্মার ঐশ্বর্য্যবর্ণনা মাত্র।" * ইহাও
একরূপ সহজ মীমাংসা হইল। যদিও রামানুজের মতে সমষ্টির
একত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার মতে নিত্যভেদ আছে।
অতএব, এ মতও কার্য্যতঃ দ্বৈত বলিয়া জীবাত্মা ও সগুণ ঈশ্বরের
ভেদ রক্ষা করা রামানুজের পক্ষে কিছু কঠিন কার্য্য হয় নাই।

এক্ষণে আমরা অদ্বৈতমতের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা এই বিষয়ে কি
বলেন, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা দেখিব, অদ্বৈতমত
কেমন দ্বৈতবাদীর সমুদয় আশা আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতেছেন,

ইতি "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চিন্মিষৎ স
ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি স ইমাল্লোঁকানসৃজত" ইতি। "একো
হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন
নক্ষত্রাণি নাপো নাগ্নির্ন সোমো ন সূর্য্যঃ স একাকী ন রমতে তস্য
ধ্যানান্তস্থস্যৈকা কন্যা দশেন্দ্রিয়াণি" ইত্যাদিষু যঃ পৃথিব্যাং
তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তর ইত্যারভ্য য আত্মনি তিষ্ঠন্নিত্যাদিষু চ
নিখিলজগন্নিয়মনং পরমপুরুষং প্রকৃত্যৈবাবশ্রূয়তে, অসন্নিহিতত্বাচ্চ,
চেতেষু নিখিলজগন্নিয়মনং প্রসঙ্গেষু মুক্তস্য সন্নিধানমস্তি যেন
জগদ্ব্যাপারস্ত্বাপি স্যাৎ।—বেদান্তসূত্র, ৪অঃ, ৪পাঃ, ১৭সূঃ, রাঃ ভাষ্য।

* অতো ন জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমিতি চেত্তন্ন আধিকারিকমণ্ডল
স্থোক্তেঃ, আধিকারিকাঃ—অধিকারেষু নিযুক্তা হিরণ্য-
গর্ভাদয়ঃ, মণ্ডলানি—তেষাং লোকাঃ তৎস্থা ভোগা মুক্তস্যা-
কর্ম্মবশ্যস্য ভবন্তি। —ঐ, ঐ, ১৮ সূত্রের ব্যাখ্যা।

আবার তৎসঙ্গে সঙ্গেই দেবশক্তিসম্পন্ন মনুষ্যজাতির উচ্চ ক্রম অনুসারে নিজ মতানুযায়ী সিদ্ধান্তও স্থাপন করিতেছেন। যাঁহারা মুক্তিলাভের পরও আপনাদের ব্যক্তিত্বরক্ষার ইচ্ছা করেন,—ভগবান হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে চান, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার ও সগুণ ব্রহ্মকে সম্ভোগ করিবার যথেষ্ট অবসর থাকিবে। ইহাদেরই কথা ভাগবত পুরাণে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ;— "হে রাজন্, হরির এতাদৃশ গুণরাশি যে, যে সকল মুনি আত্মারাম, যাঁহাদের সমুদয় বন্ধন চলিয়া গিয়াছে, তাঁহারাও ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।"*

সাংখ্যে ইঁহারাই প্রকৃতিলয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সিদ্ধি লাভ করিয়া ইঁহারাই পরকল্পে কতকগুলি জগতের শাসনকর্ত্তারূপে উৎপন্ন হন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহই কখন ঈশ্বরতুল্য হইতে পারেন না। যাঁহারা এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যেখানে সৃষ্টি, সৃষ্ট বা স্রষ্টা নাই, যেখানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় বা জ্ঞান নাই, যেখানে আমি, তুমি বা তিনি নাই, যেখানে প্রমাতা, প্রমেয় বা প্রমাণ নাই, "সেখানে কে কাহাকে দেখে ?" এরূপ লোক সব লয়ের বাহিরে গিয়াছেন, "যেখানে বাক্য অথবা মনও যাইতে পারে না," এমন স্থানে গিয়াছেন,—যাহাকে শ্রুতি 'নেতি,' 'নেতি,' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু যাঁহারা এরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারেন না, বা এরূপ অবস্থায় যাইতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা সেই এক অবিভক্ত ব্রহ্মকে প্রকৃতি, আত্মা ও ঐ উভয়ের

---

* আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থাপ্যুরুক্রমে
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।
শ্রীমদ্ভাগবত—১ স্কন্ধ, ৭ অধ্যায়, ১০ শ্লোক।

অন্তর্যামী ঈশ্বর এই ত্রিধা-বিভক্ত-রূপে দেখিলেন। যখন প্রহ্লাদ আপনাকে ভুলিয়া গেলেন, তখন তিনি জগৎ ও তাহার কারণ কিছুই দেখিতে পাইলেন না, সমুদয়ই তাঁহার নিকট নামরূপে অবিভক্ত, এক অনন্তরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। কিন্তু যখনই তাঁহার বোধ হইল, আমি প্রহ্লাদ, অমনি তাঁহার নিকট জগৎ ও অশেষ কল্যাণ গুণরাশির আধারস্বরূপ জগদীশ্বর প্রকাশিত হইলেন। মহাভাগা গোপীদিগেরও এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। যতক্ষণ তাঁহারা অহংজ্ঞানশূন্য ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহারা আবার তাঁহাকে উপাস্যরূপে ভেদভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা আবার গোপীভাব প্রাপ্ত হইলেন। "তখনই তাঁহাদের সম্মুখে মুখকমলে মৃদুহাস্যযুক্ত, পীতাম্বরধারী, মালাধারী ও মন্মথের মন-মথনকারী কৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন।" *

এক্ষণে আচার্য্য শঙ্করের কথা ধরা যাউক। শঙ্কর বলেন, "যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মোপাসনাবলে পরমেশ্বরের সহিত একীভূত হন, অথচ যাঁহাদের মন অব্যাহত থাকে, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য সসীম কি অসীম?" এই সংশয় উপস্থিত হইলে পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হয় যে, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য অসীম কারণ, শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তিনি স্বারাজ্যলাভ করেন, সমুদয় দেবতা তাঁহার পূজা করেন, "সমুদয় জগতে তাঁহাদের কামনার পূর্ত্তি হয়।" ইহার উত্তরে ব্যাস বলেন, "সৃষ্টি আদি ব্যতীত।" মুক্তাত্মগণ জগতের সৃষ্টি আদি

* তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৩২শ অধ্যায়, ২য় শ্লোক।

ব্যতীত অণিমাদি অন্যান্য শক্তি লাভ করেন। জগতের নিয়ন্তৃত্ব কেবল নিত্যমুক্ত ঈশ্বরের। কারণ, সৃষ্টিসম্বন্ধে যত শাস্ত্রীয় বচন আছে, সকল গুলিতে তিনিই কথিত হইয়াছেন। তৎস্থলে মুক্তাত্মার কোন প্রসঙ্গ নাই। সেই পরমপুরুষই জগন্নিয়ন্তৃত্বে নিযুক্ত। সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে যতগুলি শ্লোক আছে, সকল গুলিই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। আর "নিত্যসিদ্ধ" এই বিশেষণও প্রদত্ত হইয়াছে। আরও শাস্ত্র বলেন যে, অপরের অণিমাদিশক্তি ঈশ্বরের উপাসনা ও ঈশ্বরান্বেষণ হইতেই লব্ধ হয়। সুতরাং জগতের নিয়ন্তৃত্ব বিষয়ে তাঁহাদের কোন শক্তি নাই। আবার, তাঁহাদের মনের অস্তিত্ব বশতঃ এরূপ সম্ভব যে, পর পরের ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। একজন হয়ত সৃষ্টি ইচ্ছা করিলেন, অপরে নাশ ইচ্ছা করিলেন। এই গোল এড়াইবার একমাত্র উপায়—সমুদয় ইচ্ছা এক ইচ্ছার অধীন হওয়া। অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে মুক্ত পুরুষগণের ইচ্ছা সেই পরম পুরুষের অধীন।"*

---

* যে সগুণ ব্রহ্মোপাসনাৎ সহৈব মনসেশ্বর সাযুজ্যং ব্রজন্তি কিন্তেষাং নিরবগ্রহমৈশ্বর্য্যং ভবত্যাহোস্বিৎ সাবগ্রহমিতি সংশয়ঃ, কিন্তাবৎ প্রাপ্তং নিরঙ্কুশমেবৈষামৈশ্বর্য্যং ভবিতুমর্হতি, "আপ্নোতি স্বারাজ্যং," "সর্ব্বেহস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি", "তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" ইত্যাদি," শ্রুতিভ্যঃ। ইত্যেবং প্রাপ্তে পঠতি। জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমিতি। জগদুৎপত্ত্যাদিব্যাপারং বর্জ্জয়িত্বান্যদণিমাদ্যাত্মকমৈশ্বর্য্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি, জগদ্ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্যৈবেশ্বরস্য। কুতঃ, তস্য তত্র প্রকৃতত্বাদসন্নিহিতত্বাচ্চেতরেষাং পর এব হীশ্বরো। জগদ্ব্যাপারেঽধিকৃতঃ, তমেব প্রকৃত্যোৎপত্ত্যাদ্য

অতএব ভক্তি সগুণ ব্রহ্মের প্রতি প্রয়োগই সম্ভব। "দেহাভিমানী ব্যক্তি দুঃখে সেই অব্যক্ত গতি লাভ করিয়া থাকে।"* ভক্তি আমাদের প্রকৃতিস্রোতের সহিত সামঞ্জস্যভাবে প্রবাহিত। সত্য বটে, আমরা ব্রহ্মের মানবীয় ভাব দ্বারা অস্পৃষ্ট অপর কোন ভাব ধারণা করিতে পারি না, কিন্তু বাস্তবিক, আমাদের জ্ঞাত আর সকল বস্তুর সম্বন্ধেও কি ইহা সত্য নহে। জগতের সর্ব্বোচ্চ মনোবিজ্ঞানবিৎ ভগবান্ কপিল সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমাদের বাহ্য বা আন্তর সর্ব্বপ্রকার অনুভূতির মধ্যেই মানবীয় জ্ঞান একটী উপাদান। শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর পর্য্যন্ত বিচার করিলে দেখিতে পাইব, আমাদের অনুভূতি সমুদয় বস্তুই জ্ঞান ও তাহার সহিত অপর এক বস্তুর মিশ্রণ—তা সেটী যাহাই হউক। আর এই অবশ্যম্ভাবী মিশ্রণই তাহাই—যাহাকে আমরা সচরাচর সত্য বলিয়া বোধ করি। আর মনুষ্যগণের জ্ঞানসাধ্য সত্য ইহাই ও চিরকালই ইহা থাকিবে। অতএব ঈশ্বর মানব-ধর্ম্মক বলিয়া তাঁহাকে অসত্য বলা অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র। এ যেন পাশ্চাত্য ভাব-বাদ

পদেশান্নিত্যশব্দনিবন্ধনাচ্চ। তদন্বেষণ বিজিজ্ঞাসন পূর্ব্বক মিত রেষামণিমাদ্যৈশ্বর্য্যং শ্রূয়তে তেনাসন্নিহিতাস্তে জগদ্ব্যাপারে। সমনস্কত্বাদেব চৈষামনৈকমত্যে কস্যচিৎ স্থিত্যভিপ্রায়ঃ কস্যচিৎ সংহারাভিপ্রায়ঃ ইত্যেবং বিরোধোঽপি কদাচিৎ স্যাৎ। অথ কস্যচিৎ সঙ্কল্পমন্বন্যস্য সঙ্কল্প ইত্যবিরোধঃ সমর্থ্যেত, ততঃ পরমেশ্বরাকূততন্ত্রত্বমেবেতরেষামিতি ব্যবতিষ্ঠতে। ঐ, ঐ, ১৭ সূঃ, শঙ্কর ভাষ্য।

* অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।

— ভগবদ্গীতা, ১২ অঃ, ৫ম শ্লোক।

(Idealism) ও বস্তুবাদের (Realism) মধ্যে বিবাদ-দৃষ্ট।
এ বিবাদ আপাততঃ শুনিতে অতি ভয়ানক বোধ হইলেও,
বাস্তবিক 'সত্য' শব্দের অর্থ লইয়া মার প্যাঁচের উপর স্থাপিত।
"ঈশ্বরবাদীরা" সত্য শব্দের দ্বারা যত প্রকার ভাব সূচিত হইয়াছে,
ঈশ্বরের ভাবব্যাপী। জগতের অন্যান্য বস্তু যতদূর সত্য, ঈশ্বর
অন্ততঃ সেই পরিমাণেও সত্য। আর বাস্তবিক সত্য শব্দের
অর্থ যাহা করা হইয়াছে, সত্য শব্দে তদপেক্ষা অধিক কিছু
বুঝায় না। ইহাই আমাদের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় দার্শনিক ধারণা।

প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম।

ভক্তের পক্ষে এই সকল শুষ্ক বিষয় জানার প্রয়োজন
কেবল নিজ ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করা মাত্র। এতদ্ব্যতীত উহার
আর কোন উপযোগিতা নাই। কারণ, তিনি এমন এক
পথে বিচরণ করিতেছেন, যাহা শীঘ্রই তাঁহাকে যুক্তির অস্ফুট
ও অশান্তিপ্রদ রাজ্য ছাড়াইয়া লইয়া প্রত্যক্ষানুভূতির রাজ্যে
লইয়া যাইবে। তিনি শীঘ্রই ঈশ্বর কৃপায় এমন এক অবস্থায়
উপনীত হন, যেখানে পণ্ডিতী খোঁড়া যুক্তি আর যাইতে
পারে না, আর বুদ্ধির সাহায্যে অন্ধকারে হাতড়ান [illegible] হইয়া
প্রত্যক্ষানুভূতির উজ্জ্বল দিব্যালোকের প্রকাশ হয়। তিনি তখন
বিচার বা বিশ্বাস কিছুই করেন না, তিনি একরূপ প্রত্যক্ষ
অনুভব করেন। তিনি তর্ক করেন না, যেন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি
করেন। আর এই ভগবানকে দেখা, তাঁহাকে উপলব্ধি করা ও
তাঁহাকে সম্ভোগ করা কি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয় নহে?
শুধু ইহাই নহে, অনেক ভক্ত আছেন, যাঁহারা ভক্তিকে মুক্তি

হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহা কি আমাদের সর্ব্বোচ্চ উপকারও নহে? এমন লোক জগতে আছেন,—তাঁহাদের সংখ্যাও অনেক—যাঁহারা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যাহা মানুষকে শাশ্বত সুখ প্রদান করিতে পারে, তাহাতেই বাস্তবিক প্রয়োজন ও উপকারিতা আছে। ধর্ম্ম, ঈশ্বর, অনন্ত আত্মা—এগুলিও যদি টাকা অথবা দৈহিক সুখ আনয়ন না করে, তবে কোন কাজের নয়। এরূপ লোকের পক্ষে যাহাতে তাঁহাদের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ না হয়, যাহাতে তাঁহাদের বাসনার পরিতৃপ্তি না হয়, তাহাতেই কোনও প্রয়োজন নাই। এই প্রয়োজন-বোধ প্রত্যেক মানবমনে তার বিশেষ অভাবের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং যাহারা ভোজন, পান, অপত্যোৎপাদন, তার পর—মৃত্যু, ইহার উপর আর উঠিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে লাভ কেবল ইন্দ্রিয়ের সুখে। তাহাদিগকে ইহা হইতে উচ্চতর কোন বিষয়ের জন্য এক বিন্দু তৃষ্ণা পর্য্যন্ত লাভ করিতে অনেক জন্ম অপেক্ষা করিতে হইবে। যাহাদের চক্ষে কিন্তু আত্মার উন্নতি সাধন ঐহিক জীবনের ক্ষণিক সুখাপেক্ষা গুরুতর বোধ হয়, যাহাদের চক্ষে ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা কেবল অবোধ শিশুর ক্রীড়াপ্রায় বোধ হয়, তাহাদের নিকট ভগবান ও ভগবৎ প্রেমই মানব জীবনের সর্ব্বস্ব ও একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় এই সাংসারিকতাপূর্ণ জগতে এখনও এইরূপ মহাত্মা বিরল নহেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভক্তি পরা ও গৌণী এই দুই ভাগে বিভক্ত—গৌণী অর্থে সাধন ভক্তি ও পরা ভক্তি অর্থে উহারই পরিপক্কাবস্থা। ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব, এই সাধনভক্তিতে উন্নতি লাভের জন্য কতকগুলি বাহ্য সহায় আমাদের অনিবার্য্য

রূপে প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বাস্তবিক, সমুদয় ধর্ম্মের পৌরাণিক ও রূপক ভাগই স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া, উন্নতিকামী আত্মাকে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। আরও, ইহা একটী বিশেষ বিবেচ্য বিষয় যে, যে সকল ধর্ম্ম প্রণালী রূপক-ভাববহুল ও অনেক ক্রিয়াকাণ্ড সঙ্কুল, সেই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েই বড় বড় ধর্ম্মবীর জন্মিয়াছেন। যে সকল শুষ্ক গোঁড়া ধর্ম্মপ্রণালীতে কবিত্বময়, সুন্দর ও মহৎ, শিশুমনের ভগবদ্ধারণার দৃঢ় সহায় ভাবগুলিকে একেবারে উৎপাটন করিয়া ফেলিতে চাহে, যাহারা আধ্যাত্মিক ছাদের-অবলম্বন স্তম্ভগুলিকে পর্য্যন্ত ভঙ্গ করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে ও সত্যসম্বন্ধে অজ্ঞান ও ভ্রমপূর্ণ ধারণা লইয়া জীবনপ্রদ সমুদয় ভাব—যাহা মানবাত্মারূপ ক্ষেত্রে উৎপদ্যমান আধ্যাত্মিক লতার গঠনোপযোগী উপাদান—তাহাকে পর্য্যন্ত নাশ করিয়া ফেলিতে চাহে, সেই সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা শীঘ্রই দেখিতে পায় যে, তাহাদের ধর্ম্মে কেবল শূন্য খোলামাত্র অনন্তশব্দরাশি ও তর্কাভাস; হয়ত, সামাজিক মলাপসারণ বা তথাকথিত সংস্কারগন্ধযুক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যাহাদের ধর্ম্ম এইরূপ, তাহাদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জড়বাদী, তাহাদের ঐহিক, পারত্রিক জীবনের লক্ষ্য কেবল ভোগ—উহাই তাহাদের মতে মানব জীবনের সর্ব্বস্ব, উহাই তাহাদের ইষ্টাপূর্ত্ত। মানুষের ঐহিক সচ্ছন্দের জন্য অভিপ্রেত রাস্তা ঝাঁট দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যই ইহাদের মতে মানব জীবনের সর্ব্বস্ব। এই অজ্ঞান ও গোঁড়ামীর অদ্ভুত মিশ্রণ-রূপ মত অবলম্বিগণ যত শীঘ্র তাঁহাদের

ত বেশে বাহির হইয়া নাস্তিক ও জড়বাদীদের দলে যোগ দেন (ইহাই তাঁহাদের পক্ষে উপযুক্ত), ততই সংসারের মঙ্গল।

এক বিন্দু ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুভূতি কোটী কোটী বাজে বকা ও অনর্থক ভাবুকতা হইতে শ্রেষ্ঠ। অজ্ঞান ও গোঁড়ামীর এই শুষ্ক ধূলিরাশি হইতে একজন—কেবলমাত্র একজন ধর্ম্মবীর জন্মিয়াছেন, দেখাইতে পার? না পার, মুখ বন্ধ কর। হৃদয়ের কবাট সত্যের উজ্জ্বল আলোকের সম্মুখে খুলিয়া দাও, আর যাঁহারা নিজ বক্তব্য বিষয়ে অভিজ্ঞ, সেই ভারতীয় সাধুগণের পদতলে বালকের ন্যায় বসিয়া, তাঁহারা কি বলিতেছেন, শুন। তবে আইস, তাঁহারা কি বলেন, অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করি।"

গুরুর প্রয়োজনীয়তা।

সকল আত্মাই পূর্ণতা লাভ করিবে—চরমে সকলেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবে। আমরা এখন যাহা, তাহা আমাদের অতীত কার্য্য ও চিন্তার সমষ্টি। আর এক্ষণে যেরূপ চিন্তা ও কার্য্য করিতেছি, ভবিষ্যতে তাহাই হইব। কিন্তু, আমরা নিজেরাই নিজেদের অদৃষ্ট গঠন করিতেছি বলিয়া, যে বাহির হইতে আমাদের কোন সহায়তার আবশ্যক নাই, তাহা নহে। বরং অধিকাংশ স্থলে, এরূপ সহায়তা সম্পূর্ণ প্রয়োজন। যখন আমরা এই সহায়তা প্রাপ্ত হই, তখন আত্মার উচ্চতর শক্তি ও আপাতঅব্যক্ত ভাবগুলি ফুটিয়া উঠে। আধ্যাত্মিক জীবন সতেজ হইয়া উঠে, উহার উন্নতি ত্বরিত হয় ও সাধক অবশেষে শুদ্ধস্বভাব ও সিদ্ধ হইয়া যায়।

এই সঞ্জীবনী শক্তি গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। আত্মা কেবল অপর এক আত্মা হইতেই শক্তি প্রাপ্ত হয়, আর কিছু হইতেই নহে। সারা জীবন পুস্তক পাঠ করিতে পারি, খুব

একজন বুদ্ধিজীবী হইয়া উঠিতে পারি, কিন্তু শেষে দেখিব আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছু হয় নাই। বুদ্ধির খুব উন্নতি হইলেই যে, সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতিও খুব হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। গ্রন্থপাঠ করিতে করিতে অনেক সময় ভ্রমবশতঃ ভাবি, আমরা আধ্যাত্মিক উপকার লাভ করিতেছি। কিন্তু, যদি গ্রন্থপাঠে আমাদের কি ফল হইয়াছে, তাহা ধীরভাবে আলোচনা করি, তবে দেখিব, বড় জোর আমাদের বুদ্ধি একটু সতেজ হইয়াছে, অন্তরাত্মার কিছুই হয় নাই। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আধ্যাত্মিক বিষয়ে বলিতে কহিতে পটু হইলেও কার্য্যের সময়—প্রকৃত ধর্ম্মভাবে জীবন যাপন করিবার সময়, কেন এত পশ্চাৎপদ হন, তাহার কারণ গ্রন্থরাশি আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। আত্মার উন্নতি করিতে হইলে, অপর এক আত্মার শক্তি সঞ্চার আবশ্যক।

যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে গুরু বলে; এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে শিষ্য বলে। প্রথমতঃ, যিনি শক্তি সঞ্চার করিবেন, তাঁহার এই সঞ্চারের শক্তি থাকা আবশ্যক, আর যাঁহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহারও গ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক। বীজ সতেজ হওয়া আবশ্যক, ভূমিও সুকর্ষিত থাকা আবশ্যক। যেখানে এই উভয়টীই বিদ্যমান, সেখানেই প্রকৃত ধর্ম্মবিকাশ দৃষ্ট হয়। "ধর্ম্মের প্রকৃত বক্তাও আশ্চর্য্য, তাঁহার শ্রোতাও আশ্চর্য্য হওয়া আবশ্যক।" * যখন উভয়েই আশ্চর্য্য ও

---

* আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা ইত্যাদি কঠ উপনিষদ, ২য় বল্লী—৭ম শ্লোক।

অসাধারণ হয়, তখনই আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে, অন্যস্থলে নহে। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত গুরু, এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্য—মুমুক্ষু। আর সকলে ধর্ম্ম লইয়া ছেলে-খেলা করে মাত্র। তাহাদের কেবল একটু ঔৎসুক্য—ধর্ম্মসম্বন্ধে একটু বুদ্ধির ঔৎসুক্য হইয়াছে। কিন্তু তাহারা এখনও ধর্ম্মচক্রবালের বহির্দ্দেশে রহিয়াছে। অবশ্য, ইহারও কিছু মূল্য আছে বটে, কারণ সময়ে উহা হইতেই প্রকৃত ধর্ম্ম-পিপাসা আসিতে পারে। আর প্রকৃতির এই বিচিত্র নিয়ম যে, যখনই ক্ষেত্র উপযুক্ত হয়, তখনই বীজ নিশ্চয়ই আসিবে, আসিয়াও থাকে। যখন গ্রহীতার আত্মায় ধর্ম্মালোকাকর্ষক শক্তি পূর্ণ ও প্রবল হয়, তখন সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট আলোকদায়িনী শক্তি অবশ্যই আসিয়া থাকে।

তবে পথে কতকগুলি মহাবিঘ্ন আছে। ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসা বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। আমরা নিজেদের জীবনেই ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি। আমাদের জীবনে অনেক সময়ে এরূপ দেখা যায়—হয় ত কাহাকেও খুব ভাল বাসিতাম; তাহার মৃত্যু হইল—আঘাত পাইলাম। মনে হইতে লাগিল এতদিনের সুখের সংসার বুঝি শূন্য হইল—যেন ধরি ধরি ধরা যায় না। আমাদের স্থায়ী ও উচ্চতর কিছু অবলম্বন—আমাদের ধার্ম্মিক হওয়া আবশ্যক। কয়েক দিনেই ঐ ভাবতরঙ্গ কোথায় চলিয়া গেল, আমরা যেখানে ছিলাম, সেই খানে পড়িয়া রহিলাম। আমরা সকলেই এইরূপ ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসা বলিয়া ভ্রমে পড়িতেছি। কিন্তু যতদিন এই ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসগুলিকে ভ্রমবশে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসা মনে করিব, ততদিন ধর্ম্মের জন্য আত্মার স্থায়ী জীবন্ত আগ্রহ হইবে

না। আর ততদিন আত্মার মধ্যে শক্তিসঞ্চারণকারী গুরুদেবেরও সাক্ষাৎকার লাভ হইবে না। এই কারণে যখনই আমাদের মনে হয়, আমাদের সত্যলাভের জন্য এই চেষ্টা সমুদয় বৃথা হইতেছে, তখনই ঐ রূপ মনে করা অপেক্ষা নিজেদের অন্তস্তলে অন্বেষণ করিয়া দেখা উচিত, হৃদয়ে প্রকৃত আগ্রহ জন্মিয়াছে কি না। এইরূপ করিলে অধিকাংশ স্থলেই আমরা দেখিব, আমরাই সত্য-গ্রহণের উপযুক্ত নহি। আমাদের প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসা হয় নাই।

আবার শক্তিসঞ্চারক গুরুসম্বন্ধে আরও অনেক বিঘ্ন আছে। অনেকে আছেন, যাঁহারা স্বয়ং অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়াও অহঙ্কারে আপনাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করেন; শুধু তাহাই নহে, অপরকেও নিজ স্কন্ধে লইয়া যাইবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। এইরূপে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে উভয়েই খানায় পড়িয়া যায়। "অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, অতি নির্ব্বুদ্ধি হইলেও আপনাকে মহাপণ্ডিত মনে করিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে।"* জগৎ এতদ্বিধ জনগণে পরিপূর্ণ—সকলেই গুরু হইতে চাহে; সকল ভিক্ষুকই এক লক্ষ টাকা দান করিতে চায়! এই ভিক্ষুকগণ যেমন হাস্যাস্পদ হয়, এই সকল গুরুনামধারীরাও তদ্রূপ।

---

* অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ॥
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

কঠ-উপনিষদ্, দ্বিতীয় বল্লী, ৫ম শ্লোক।

গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ।

তবে গুরু চিনিব কিরূপে? সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে আর মশালের আবশ্যক হয় না। তাঁহাকে দেখিবার জন্য আর বাতি জালিবার আবশ্যক হয় না। সূর্য্য উদিত হইলে, আমরা তৎক্ষণাৎ উহা জানিতে পারি; আর, লোকগুরুর অভ্যুদয় হইলে আত্মা অমনিই জানিতে পারেন যে, তাঁহার উপর সত্যের সূর্য্যালোক পতিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সত্য স্বতঃপ্রমাণ—উহা প্রমাণ করিতে অপর কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন নাই—উহা স্বপ্রকাশ। উহা আমাদের প্রকৃতির অন্তস্তলে প্রবেশ করে—উহার সমক্ষে সমস্ত জগৎ দাঁড়াইয়া বলে—'ইহাই সত্য।' যে সকল আচার্য্যের হৃদয়ে জ্ঞান ও সত্য সূর্য্যালোকের ন্যায় প্রকাশিত, তাঁহারা জগতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ মহাপুরুষ, আর জগতের অধিকাংশ লোকেই তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত অল্পজ্ঞানিগণের নিকটও আধ্যাত্মিক সাহায্য লাভ করিতে পারি। তবে আমাদের সেরূপ অন্তর্দৃষ্টি নাই বলিয়া, আমরা আমাদের আচার্য্যের গুণরাশি দেখিতে পাই না। এই কারণে গুরু শিষ্য উভয়ের সম্বন্ধেই কতকগুলি পরীক্ষার আবশ্যক।

শিষ্যের এই গুণগুলি আবশ্যক—পবিত্রতা, প্রবল জ্ঞান-পিপাসা, ও অধ্যবসায়। কোন অপবিত্র আত্মাই প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে পারে না। ধার্ম্মিক হইতে গেলে কায়মনোবাক্যে পবিত্র হওয়া আবশ্যক। আর জ্ঞানতৃষ্ণা সম্বন্ধে বক্তব্য এই, প্রাচীনকাল হইতেই এই নিয়ম জানা আছে যে, আমরা যাহা চাই, তাহাই লাভ করিয়া থাকি। আমরা যে বস্তুর উপর আমাদের চিত্ত স্থাপন না করি, আমরা সেই বস্তু লাভ

করিতে পারি না। ধর্মের জন্য ব্যাকুলতা বড় কঠিন জিনিষ— আমরা সচরাচর উহা যত সোজা মনে করি, উহা তত সোজা নহে। শুধু ধর্মকথা শুনিলে ও ধর্মপুস্তক পড়িলেই যে ব্যক্তিবিশ হৃদয়ে ধর্মভাব প্রবল হইয়াছে, তাহা প্রমাণ হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত ব্যাকুলতা প্রাণে জাগরিত না হয়, ও আমরা প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ না করিতে পারি, ততদিন সদাসর্ব্বদা অভ্যাস ও আমাদের নীচ প্রকৃতির সহিত সর্ব্বদা সংগ্রাম আবশ্যক। উহা এক দিন, দুই দিন, কয়েক বৎসর অথবা সমুদয় জীবনের কর্ম্ম নহে; এই চেষ্টা করিতে শত শত জন্ম লাগিতে পারে। কখন কখন সিদ্ধি এক মুহূর্ত্তে আসিতে পারে, কিন্তু আমাদের যদি অনন্ত সময় অপেক্ষা করিতে হয়, ততদিন পর্য্যন্তও অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। যে শিষ্য এইরূপ অধ্যবসায় লইয়া অগ্রসর হয়, সে অবশেষে সিদ্ধি লাভ করিবে।

গুরুর সম্বন্ধে এইটুকু বোঝা আবশ্যক যে, তিনি যেন শাস্ত্রের মর্ম্ম জানেন। জগতের সকলেই বেদ, বাইবেল, কোরাণ পাঠে অনুরক্ত। উহারা ত শব্দসমষ্টিমাত্র—ধর্ম্মের কয়েকখানা শুকনো হাড়মাত্র। যে গুরু, শব্দ লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করেন, ও মনকে কেবল শব্দের শক্তি দ্বারা চালিত হইতে দেন, তিনি ভাব হারাইয়া ফেলেন। শাস্ত্রের মর্ম্ম যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মাচার্য্য। শাস্ত্রের শব্দজাল যেন মহাবনস্বরূপ, মানুষ আপনাকে উহার ভিতর হারাইয়া ফেলে, পথ খুঁজিয়া পায় না। "শব্দজাল মহাবনসদৃশ, চিত্তের ভ্রমণের কারণ।"* "শব্দ যোজনা করিবার

---

* শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণং

—বিবেকচূড়ামণি, ৬২ শ্লোক।

বিভিন্ন উপায়, সুন্দর ভাষায় বক্তৃতা করিবার বিভিন্ন উপায় ও শাস্ত্রের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার বিভিন্ন উপায়,—পণ্ডিতদিগের বিচার ও আমোদের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু উহা দ্বারা জ্ঞানদৃষ্টির বিকাশ হয় না"। * যাহারা ধর্ম্মব্যাখ্যার সময় এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করে, তাহারা কেবল আপনাদের পাণ্ডিত্য দেখাইতেই ইচ্ছুক, তাহাদের ইচ্ছা—লোকে আমাদিগকে মহাপণ্ডিত বলিয়া মান্য করুক। জগতের কোন প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যই এইরূপ নানাবিধ শাস্ত্রব্যাখ্যায় অগ্রসর হন নাই। তাঁহারা, শাস্ত্রের শ্লোকের অর্থ, ইচ্ছানুযায়ী ব্যাখ্যা করিতে কখন চেষ্টা করেন নাই ; শব্দ ও উহাদের ধাতুগুলির অর্থ লইয়া তাঁহারা ক্রমাগত উল্‌টা পাল্‌টাও করেন নাই। তবু তাঁহারা জগৎকে অতি সুন্দর শিক্ষা দিয়াছেন। আর যাঁহাদের কিছু শিখাইবার নাই, তাঁহারা হয় ত, একটী শব্দ লইয়া তাহারই উপর এক তিনখণ্ড পুস্তক রচনা করিলেন, সেই শব্দের আদি কি, কে ঐ শব্দটী প্রথম ব্যবহার করিল, সে কি খাইত, কতক্ষণ ঘুমাইত, এইরূপ এইরূপ বিষয় লইয়াই তিনি আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

ভগবান্ রামকৃষ্ণ একটী গল্প বলিতেন ; কতকগুলি লোক—একটী আমবাগানে গেল ; গিয়া উহার কত পাতা, কতগুলি ডাল পালা সব গণিতে লাগিল। উহাদের রঙের পরীক্ষা করিতে লাগিল, ভিন্ন ভিন্ন পাতার আকৃতির তুলনা করিতে লাগিল ; তার পরে এই সবগুলি ভাল করিয়া টুকিয়া লইয়া, উহার প্রত্যেক

---

* বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলং।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥
ঐ—৬০ শ্লোক।

বিষয় লইয়া খুব পণ্ডিতী ধরণে বিস্তর বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে লাগিল। অবশ্য তাহারা ইহাতে খুব আমোদ পাইয়াছিল। কিন্তু,তাহাদের মধ্যে একব্যক্তি সকলের অপেক্ষা বুদ্ধিমান ছিল—সে ওসব দিকে না যাইয়া, আম পাড়িয়া খাইতে লাগিল। তাহাকে কি বুদ্ধিমান বলিব না? অতএব, এই পাতা ডাল পালা গোণা ও টুকিয়া লইয়া অপরের নিকট দেখান-ভাব একেবারে ছাড়িয়া দাও। অবশ্য, ইহারও প্রকৃত স্থান আছে, কিন্তু ধর্ম্ম জগতে নহে। এই পাতা-ওল্‌টান দলের ভিতর হইতে একটীও ধর্ম্মবীর বাহির করিতে পারিবে না। ধর্ম্ম—যাহা মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য, মানুষের সর্ব্বোচ্চ গৌরবের জিনিষ, তাহাতে পাতা ওল্‌টানরূপ অত পরিশ্রমের আবশ্যক করে না। যদি তুমি ভক্ত হইতে চাও, তাহা হইলে, কৃষ্ণ মথুরায় কি ব্রজে জন্মিয়াছিলেন, তিনি কি করিয়াছিলেন, বা ঠিক কোন্ দিনে গীতা বলিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কিছু আবশ্যক নাই। গীতায় যে কর্ত্তব্য ও প্রেম-সম্বন্ধীয় সুন্দর শিক্ষা আছে, তাহার জন্য ব্যাকুল হওয়াই তোমার আবশ্যক। উহার সম্বন্ধে অথবা উহার প্রণেতার সম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষ বিবরণ জানা কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য! তারা যা চায়, তাহাদিগকে তাই দাও। তাহাদের পণ্ডিতী তর্ক বিচারে শান্তিঃ শান্তিঃ বলিয়া আমরা আম খাইতে থাকি, আইস।

দ্বিতীয়তঃ, গুরুর নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। অনেক সময়ে লোকে জিজ্ঞাসা করে, 'গুরুর চরিত্র, গুরু কি করেন না করেন, দেখিবার প্রয়োজন কি? তিনি যা বলেন, সেইটী লইয়াই আমাদের কায করা আবশ্যক।'—একথা ঠিক নয়। গতি-বিজ্ঞান, রসায়ন বা অন্য কোন পদার্থ-বিজ্ঞান শিখাইতে হইলে শিক্ষক যাহাই হউন না কেন, কিছু আসিয়া যায় না। কারণ, উহাতে

কেবল বুদ্ধির চালনা—বুদ্ধিকে কিঞ্চিৎ সতেজ করাই প্রয়োজন হয়। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞান শিখাইতে হইলে যিনি শিখাইবেন তিনি অপবিত্র হইলে, কিছুতেই তাঁহার ভিতর অধ্যাত্মজ্যোতিঃ থাকিতে পারে না। অপবিত্র লোক আবার ধর্ম্ম কি শিখাইবে? নিজে আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিবার বা অপরে সঞ্চার করিবার, একমাত্র উপায়—চিত্তের পবিত্রতা। আত্মা যতদিন না শুদ্ধ হইতেছেন, ততদিন ভগবদ্দর্শন বা সেই সর্ব্বাতীত বস্তুর চকিতের ন্যায় অনুভূতিও সম্ভব নহে। সুতরাং, আচার্য্যের সম্বন্ধে প্রথম তিনি কি, তাহা দেখা আবশ্যক, তার পর তিনি কি বলেন, তাহা দেখিতে হইবে। তাঁহার সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলেই তাঁহার কথার প্রকৃত একটা গুরুত্ব থাকে, আর তাহা হইলেই তিনি প্রকৃত শক্তি-সঞ্চারকের যোগ্য হইতে পারেন। নিজের মধ্যে যদি শক্তি না রহিল, তবে তিনি সঞ্চার করিবেন কি? গুরুর মন প্রকৃত আধ্যাত্মিক-কম্পন-বিশিষ্ট হওয়া চাই, তাহা হইলে উহা সমবেদনাবশে শিষ্যে সঞ্চারিত হইয়া যাইবে। গুরুর বাস্তবিক কার্য্যই এই—কিছু সঞ্চার করা, কেবল শিষ্যে বর্ত্তমান বুদ্ধিশক্তি বা অন্য কোন শক্তি উত্তেজিত করিয়া দেওয়া নহে। বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, গুরুর নিকট হইতে শিষ্যে যথার্থই একটা শক্তি আসিতেছে। সুতরাং, গুরুর শুদ্ধচিত্ত হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ, গুরুর উদ্দেশ্য কি, দেখা আবশ্যক। গুরু যেন অর্থ, নাম বা যশের জন্য ধর্ম্মশিক্ষাদানে প্রবৃত্ত না হন—সমুদয় মানবজাতির জন্য পবিত্র প্রেমই যেন তাঁহার কার্য্যের নিয়ামক হয়। আধ্যাত্মিক শক্তি কেবল প্রেমরূপ মধ্যবর্ত্তী বস্তুর মধ্য দিয়াই সঞ্চারিত করা যাইতে পারে। অন্য কোন রূপ স্বার্থপূর্ণ ভাব,

যথা লাভ বা যশের ইচ্ছা, এক মুহূর্তেই এই মধ্যবর্ত্তীকে নষ্ট করিয়া ফেলে। ভগবান প্রেমস্বরূপ, আর যিনি ভগবানকে প্রেমস্বরূপ বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই মানুষকে পবিত্রতা ও ঈশ্বরতত্ত্ব শিখাইতে পারেন।

গুরুতে এই সমস্ত লক্ষণগুলি দেখিলেই তুমি জানিবে, তোমার কোন আশঙ্কা নাই। নতুবা তাঁহার নিকট শিক্ষায় বিপদ আছে, যে হেতু তিনি যদি হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্চার করিতে না পারেন, হয় ত অসদ্ভাব সঞ্চার করিবেন। এই বিপদ্ হইতে আপনাকে সাবধান রাখিতে হইবে। 'যিনি বিদ্বান্, নিষ্পাপ ও কামশূন্য, তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ।' *

যাহা বলা হইল, তাহা হইতে ইহা সহজেই প্রতীত হইবে, ধর্ম্ম যেথা সেথানে, যাহার তাহার নিকট হইতে শিখিবার বা লাভ করিবার জিনিষ নহে। "প্রস্তরের উপদেশশ্রবণ, ক্রতগামিনী স্রোতস্বিনীতে পুস্তকপাঠ ও সকল বস্তুতে শুভদর্শন",† অবশ্য সুন্দর আলঙ্কারিক বর্ণনা বটে, কিন্তু যাহার নিজের ভিতরে ধর্ম্মের অপরিস্ফুট বীজও নাই, তাহাকে কেহই একবিন্দুও সত্য দিতে পারে না। প্রস্তর নদী আদি কাহার নিকট উপদেশপূর্ণ বোধ হয়? যাঁহার অন্তরের পবিত্র মন্দিরাভ্যন্তরীণ কমল ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই আত্মার পক্ষে। আর যে আলোকে, এই কমল সুন্দর

* শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।

—বিবেকচূড়ামণি, ৩৪ শ্লোক।

† Sermon in stones, books in running brooks and good in everything.

—Shakespeare.

রূপে ফুটিয়া উঠে, তাহা জ্ঞানী সদ্‌গুরুর জ্ঞানালোক। যখন হৃৎপদ্ম এইরূপে ফুটিয়া উঠে, তখন তিনি প্রস্তর, নদী, তারা, সূর্য্য, চন্দ্র অথবা ব্রহ্মব্যাপ্ত এই জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা হইতেই শিক্ষা পাইতে পারেন। কিন্তু যাহার হৃদয় এখনও খুলে নাই, সে তাহাতে কেবল প্রস্তর বা নদীই দেখিবে। অন্ধের যাদুঘরে গিয়া কি ফল? অগ্রে তাহাকে চক্ষু দাও, তবে সে সেখানকার বস্তুসমূহ হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়, বুঝিতে পারিবে।

গুরুই ধর্ম্মশিক্ষার্থীর চক্ষু খুলিয়া দেন। সুতরাং গুরুর সহিত সম্বন্ধ পূর্ব্ব পুরুষের সহিত পরবংশীয়দের যে সম্বন্ধ। গুরুর প্রতি বিশ্বাস, তাঁহার নিকট বিনীত ভাব ধারণ, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার, ও তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্ম-বিকাশ হইতেই পারে না। আর ইহাও একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় যে, যে সব দেশে গুরুশিষ্যের এতদ্বিধ সম্বন্ধ আছে, সেই সব দেশেই বড় বড় ধর্ম্মবীর জন্মিয়াছেন, আর যে সব দেশে গুরুশিষ্যের এ সম্বন্ধ নাই, গুরু কেবল বক্তামাত্র হইয়া দাঁড়ান, নিজের প্রাপ্যের দিকেই নজর, আর শিষ্য কেবল গুরুর কথা-গুলিতেই মাথা পরিপূর্ণ করিয়া নিজের নিজের পথ দেখেন, সে সকল স্থলে ধর্ম্মের ঘরে শূন্য বলিলেই হয়। শক্তি সঞ্চার করিবার কেহ নাই, গ্রহণ করিবারও কেহ নাই। ধর্ম্ম এই সব লোকের কাছে যেন ব্যবসা হইয়া দাঁড়ায়। তারা মনে করে, এ টাকা দিয়ে কিনিবার জিনিষ। ঈশ্বর করুন, যেন এত সহজে ধর্ম্ম পাওয়া যায়। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হইবার নয়।

ধর্ম্ম—সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান স্বরূপ যে ধর্ম্ম, তাহা ধনবিনিময়ে কিনি-বার জিনিষ নহে—গ্রন্থ হইতেও পাওয়া যায় না। জগতের সর্ব্বত্র

ভ্রমণ করিয়া আসিতে পার, হিমালয় আল্পস্ ককেসস্ প্রভৃতি ঘুঁটিয়া ফেলিতে পার, সমুদ্রের অতলতল আলোড়ন করিতে পার, তিব্বতের চারি কোণে অথবা গোবি মরুর চতুর্দ্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পার, কোথাও এই জ্ঞান পাইবে না, যতদিন না তোমার হৃদয় ইহা ধারণা করিতে সমর্থ হইতেছে ও যতদিন না তুমি গুরু-লাভ করিতেছ। বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট এই গুরু যখনই লাভ করিবে, অমনি বালকবৎ বিশ্বাস ও সরলতায় তাঁহার নিকট প্রাণ খুলিয়া দাও। তাঁহাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখ। যাহারা এইরূপ প্রেম ও শ্রদ্ধা লইয়া সত্যানুসন্ধানে আইসে, তাহাদের নিকট সত্যের ভগবান্, সত্য শিব ও সৌন্দর্য্যের অলৌকিক তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করেন।

যেখানে লোকে তাঁহার নামানুকীর্ত্তন করে, সেই স্থানই পবিত্র। যে ব্যক্তি তাঁহার নামোচ্চারণ করে, সে আরো কত পবিত্র, বিবেচনা কর; সুতরাং যাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রাপ্ত হই, তাঁহার নিকট কতদূর ভক্তির সহিত অগ্রসর হওয়া উচিত! ঐরূপ শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মাচার্য্যগণের সংখ্যা জগতে খুব বিরল বটে, কিন্তু জগৎ একেবারে এই সকল আচার্য্যবিরহিত নহে। যে মুহূর্ত্তে উহা একেবারে আচার্য্যশূন্য হয়, সেই মুহূর্ত্তেই ইহা এক ভয়ানক নরককুণ্ডরূপে পরিণত হয় ও বিনাশের দিকে অগ্রসর হয়। ইহারা মানবজীবনোদ্যানের সুচারু পুষ্পস্বরূপ ও অহেতুকদয়াসিন্ধু।* শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে বলিয়াছেন, 'আমাকে আচার্য্য বলিয়া জানিও'†।

---

* বিবেকচূড়ামণি ৩৫ শ্লোক।

† আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ ইত্যাদি।

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্কঃ, ১৭ অঃ, ২৬ শ্লোক।

অবতার।

এই সাধারণ গুরুশ্রেণী হইতে উন্নত আর এক শ্রেণীর গুরু আছেন—ঈশ্বরের অবতারগণ। ইঁহারা স্পর্শদ্বারা, এমন কি কেবল-মাত্র ইচ্ছা দ্বারাই অপরে ভগবদ্ভাব সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের আজ্ঞায় অতি দুরাচার ব্যক্তিও মুহূর্ত্তের মধ্যে সাধুরূপে পরিণত হয়। ইঁহারা সকল গুরুরও গুরু—মানুষের ভিতর ভগবানের উচ্চতম প্রকাশ। আমরা তাঁহাদের ভিতর দিয়া ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবানকে দেখিতে পারি না। আমরা তাঁহাদিগকে উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারি না। আর কেবল ইঁহাদিগকেই আমরা উপাসনা করিতে বাধ্য।

এই সকল মানবীয় বিকাশ ব্যতীত আর ভগবানকে দেখিবার অন্য কোন উপায় নাই। যদি আমরা আর কোন রূপে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তবে আমরা একটা কিম্ভূতকিমাকার করিয়া ফেলি ও উহাকেই প্রকৃত ঈশ্বর বলিয়া মনে করি। গল্প আছে, এক আনাড়ি শিব গড়িতে অনেক দিন চেষ্টা করিয়া একটা বানর গড়িয়াছিল। সেইরূপ ভগবানকে নির্গুণ পূর্ণ স্বরূপে ভাবিতে গেলেই, আমরা একেবারে উহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকি, কারণ আমরা যতদিন মানুষ আছি, ততদিন মানুষের ভিতর ও মানুষরূপেই তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে। যাই বল না কেন, যতই চেষ্টা কর না কেন, ভগবানকে মানুষ ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পার না। ঈশ্বর সম্বন্ধে—সংসারের সকল বস্তুর সম্বন্ধে, খুব যুক্তিতর্কসমন্বিত বক্তৃতা দিতে পার, খুব যুক্তিবাদী হইতে পার, আর নিজেকে সন্তোষপূর্ব্বক বুঝাইতে পার যে, ভগবানের এই সকল মনুষ্যাবতারের কথা

সব ভুল। কিন্তু একবার সহজ কথায় আসিয়া দেখ। এইরূপ অদ্ভুত বুদ্ধির পশ্চাতে কি পাওয়া যায়? ভুও—শূন্য, কেবল কতক গুলি বাহ্যাড়ম্বর। তারপরও যদি কোন লোক এইরূপ অবজ্ঞায় পূজার বিরুদ্ধে মহাযুক্তিতর্কের সহিত বক্তৃতা করিতেছেন দেখ, তবে তাঁহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা কর, ভাই, তোমার ঈশ্বর-ধারণা কি? সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বব্যাপিতা ও এতদ্বিধ শব্দে কি বুঝায়, তাহা তিনি ঐ শব্দগুলির বানান ব্যতীত কি বোঝেন? এ সব শব্দের দ্বারা তিনি কোন কিছুকেই লক্ষ্য করেন না। তিনি ইহাদের অর্থস্বরূপে এমন কোন ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন না, যাহাতে তাঁহার মনুষ্যস্বভাবের কিছু আঁচ না লাগে। এই বিষয়ে রাস্তার যে লোকটা একখানা পুঁথিও পড়ে নাই, তাহার সহিত ইঁহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তবে সে লোকটা শান্তপ্রকৃতি, জগতের শান্তিভঙ্গ করে না, আর এই লম্বা-চৌড়া-বাক্য-ব্যয়কারী মানুষের মধ্যে গোলমাল, দুঃখ আনিয়া দেয়। যাই বলা হউক না কেন, প্রত্যক্ষানুভূতির নাম ধর্ম্ম, আর আমরা এই লম্বা চৌড়া কথা, আর প্রত্যক্ষানুভূতির ভিতর যেন বিশেষ তফাত করি। আত্মার গভীরতম প্রদেশে আমরা যাহা অনুভব করি, তাহাকেই প্রত্যক্ষানুভূতি বলে। এই বিষয়ে সাধারণের জ্ঞান যত দুর্লভ, আর কিছুই তত নহে।

আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই ভগবানকে মনুষ্যরূপে দেখিতে হইবে। মনে কর, মহিষদের ভগবানকে পূজা করিবার ইচ্ছা হইল—তাহাদের স্বভাবানুযায়ী তাহারা ভগবানকে একটা বৃহৎ মহিষ দেখিবে। মৎস্য ভগবানের আরাধনেচ্ছু হইলে, তাহার ভগবানকে একটা বৃহৎ মৎস্য ভাবিতে হইবে—মানুষকেও ভগবানকে মানুষ

আসিতে হইবে। আর মনে করিও না, ঐ সকল বিভিন্ন ধারণা বিকৃতকল্পনাসম্ভূতমাত্র। মানুষ, মহিষ, মৎস্য এগুলি যেন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্বরূপ—সকল গুলিই ভগবৎ-সমুদ্রে নিজেদের শক্তি ও আকৃতি অনুসারে পূর্ণ হইতে গেল। মানুষে ঐ জল মানুষের আকার ধারণ করিল। মহিষে মহিষের আকার ও মৎস্যে মৎস্যাকার ধারণ করিল। এই প্রত্যেক পাত্রেই সেই একই ঈশ্বর সমুদ্রের জল রহিয়াছে। মানুষ তাঁহাকে মানুষরূপে দেখিবে, আর পশুদের যদি কোন ভগবানের জ্ঞান থাকে, তবে তাহারা নিজেদের ধারণানুরূপ পশুরূপে তাঁহাকে ভাবিবে। সুতরাং আমরা ভগবানকে মানুষরূপে না দেখিয়া থাকিতে পারি না। সুতরাং আমাদের তাঁহাকে মনুষ্যরূপেই উপাসনা করিতে হইবে—অন্য কোন পথ নাই।

দু রকম লোক ভগবানকে মানুষরূপে উপাসনা করে না—মানুষপশু, যার কোন ধর্মজ্ঞান নাই, আর পরমহংস, যিনি মনুষ্য-জাতির স্বাভাবিক সমুদয় দুর্বলতা অতিক্রম করিয়াছেন ও নিজ মানবীয় প্রকৃতির বাহিরে গিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে সমুদয় প্রকৃতি তাঁহার আত্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। তিনিই কেবল ভগবানকে তাঁহার স্বরূপে উপাসনা করিতে পারেন। অন্য সব বিষয়েও যেমন, এখানেও তেমন, দুটী চূড়ান্তভাব একরূপ দেখায়। অতিশয় অজ্ঞানী ও অতিশয় জ্ঞানী কেহই উপাসনা করে না। মানব-পশু অজ্ঞানবশতঃ উপাসনা করে না, আর জীবন্মুক্ত পুরুষ আত্মার মধ্যে পরমাত্মার অনুভূতি হেতু উপাসনা করেন না। এই দুই মেরুর মধ্যদেশে থাকিয়া, যদি কেহ তোমায় বলেন, আমি ভগবানকে মনুষ্যরূপে উপাসনা করিতে ইচ্ছা করি না, সেই ব্যক্তির একটু বিশেষ খবর রাখিও। আর কোন শক্ত

কথা তাহাকে না বলিলেও, সে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য বাচাপমাত্র। তাহার ধর্ম্ম বিকৃতমস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কহীনদের জন্য।

ভগবান মানুষের দুর্ব্বলতা বুঝেন, আর মানুষের হিতের জন্য মানুষরূপে অবতীর্ণ হন। "যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃজন করি। সাধুদের রক্ষা, দুষ্কৃতদের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য আমি যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি।" * "অজ্ঞ ব্যক্তিরা জগতের ঈশ্বরস্বরূপ আমার প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া, মনুষ্যরূপধারী আমাকে উপহাস করে।" † ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অবতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন। ভগবান্ রামকৃষ্ণ বলিতেন, "যখন প্রবল বন্যা আইসে, তখন সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও খানা আপনা আপনিই কিনারা পর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়া যায়। সেইরূপ যখন অবতার আসেন, তখন জগতের ভিতর মহা আধ্যাত্মিক ধর্ম্মতরঙ্গ উত্থিত হয়। সেখানকার হাওয়াতেই যেন ধর্ম্মভাব খেলিতে থাকে।"

---

* যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সংভবামি যুগে যুগে॥
গীতা, ৪র্থ অধ্যায়। ৭ম, ৮ম শ্লোক।

† অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
গীতা, ৯ম অধ্যায়, ১১শ শ্লোক।

মন্ত্র।

কিন্তু এক্ষণে আমরা এই মহাপুরুষ—এই অবতারগণের বিষয় বলিতেছি না, এক্ষণে আমরা সিদ্ধ গুরুদিগের বিষয় আলোচনা করিব। তাঁহাদের সচরাচর মন্ত্রদ্বারা মানুষের ভিতরে জ্ঞান সঞ্চার করিতে হয়। এই মন্ত্রগুলি কি? ভারতীয় দর্শন মতে, সমুদয় জগৎ নামরূপাত্মক। এই ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড-মনুষ্যের চিত্তে এমন একটীও তরঙ্গ থাকিতে পারে না, যাহা নামরূপের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। যদি ইহা সত্য হয় যে, প্রকৃতি সর্ব্বত্রই এক নিয়মে নির্ম্মিত, তাহা হইলে এই নামরূপের দ্বারা সীমাবদ্ধ হওয়া সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম বলিতে হইবে। "যেমন একটী মৃৎপিণ্ডকে জানিলে, আর সমস্ত মৃত্তিকাকেও জানিতে পারা যায়," * সেইরূপ দেহপিণ্ডকে জানিতে পারিলেই, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকেও জানিতে পারা যায়। রূপ বহির্ভাগ, নাম অথবা ভাব উহার ভিতরের বস্তু। শরীর বাহ্য আকৃতি, মন বা অন্তঃকরণ নাম, আর বাচা শব্দগুলি বাক্‌শক্তিযুক্ত প্রাণিসমূহে নামের সহিত অভেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। মানুষের ভিতরে এই চিন্তাতরঙ্গগুলি প্রথমে শব্দ, পরে তদপেক্ষা স্থূলতর আকৃতিরূপে ব্যষ্টি মহৎ অর্থাৎ চিত্তে প্রকাশ পায়।

বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টিমহৎ প্রথমে নাম, পরে রূপাকারে অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎরূপে প্রকাশ পান। এই ব্যক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই রূপ, ইহার পশ্চাতে অনন্ত অব্যক্ত স্ফোট রহিয়াছেন—স্ফোট অর্থে সমুদয় জগতের

---

* যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদি। ছান্দোগ্য—৬ষ্ঠ প্রঃ, ১ম খঃ।

থাকিবার কারণ শব্দব্রহ্ম। সমুদয় নাম অর্থাৎ ভাবের অনন্ত সমবায়ী উপাদান এই অনন্ত স্ফোটই সেই শক্তি, যদ্দ্বারা ভগবান এই জগৎ সৃজন করেন। শুধু তাহাই নহে, ভগবান প্রথমে আপনাকে স্ফোটরূপে পরিণত করিয়া, পরে অপেক্ষাকৃত স্থূল এই পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে পরিণত করেন। এই স্ফোটের একমাত্র বাচক শব্দ আছে—ওঁ। আর, কোনরূপ বিশ্লেষণবলেই শব্দ হইতে ভাবকে আমরা পৃথক্ করিতে পারি না বলিয়া এই ওঙ্কার ও এই নিত্য স্ফোট চিরসম্বদ্ধ। সুতরাং অনায়াসে মনে করা যাইতে পারে, সমুদয় নামরূপের জনক-স্বরূপ ওঙ্কাররূপ এই পবিত্রতম শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তবে যদি বল যে, শব্দ ও ভাব নিত্যসম্বদ্ধ বটে, কিন্তু একটী ভাবের জন্য অনন্ত বাচক শব্দ থাকিতে পারে, সুতরাং সমুদয় জগতের অভিব্যক্তির কারণ-স্বরূপ ভাবের যে একমাত্র ওঙ্কারই বাচক থাকিবে, তাহার কোন অর্থ নাই। এ কথা বলিলে আমাদের উত্তর এই,—ওঙ্কারই এইরূপ সর্ব্বভাবব্যাপী বাচক শব্দ, আর কোন শব্দ এতত্তুল্য নহে। স্ফোটই সমুদয় শব্দের উপাদান অথচ উহা কোন পূর্ণ-বিকশিত শব্দ নহে। অর্থাৎ যদি এক শব্দ হইতে আর এক শব্দের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা তুলিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে এই স্ফোটই অবশিষ্ট থাকিবে, সুতরাং এই স্ফোটকে নাদব্রহ্ম বলে। যে কোন বাচক শব্দই হউক না কেন, অব্যক্ত স্ফোটকে প্রকাশ করিতে হইলে, তাহাকে এতদূর বিশিষ্ট করিয়া ফেলিবে যে, তাহার স্ফোটত্ব থাকিবে না। সুতরাং যে বাচক শব্দ উহাকে খুব কম বিশিষ্ট করিবে, আর যথা-সম্ভব উহার স্বরূপ প্রকাশ করিবে, তাহাই উহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃত বাচক হইবে। ওঙ্কার—কেবলমাত্র ওঙ্কারই এইরূপ। কারণ

অ, উ, ম এই তিনটী অক্ষর একত্রে "অউম্" এইরূপে উচ্চারিত হইলে, উহাই সর্ব্বপ্রকার শব্দের সাধারণ বাচক হইতে পারে। অ—সমুদয় শব্দের ভিতরে সর্ব্বাপেক্ষা কম বিশিষ্ট। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, 'আমি অক্ষরের মধ্যে অকার।' * আর সমুদয় স্পষ্টোচ্চারিত শব্দই মুখগহ্বরের মধ্যে জিহ্বামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ওষ্ঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয়। 'অ'—কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত, 'ম'—শেষ ওষ্ঠ শব্দ। আর 'উ' জিহ্বামূল হইতে যে শক্তি আরম্ভ হইয়া ওষ্ঠে শেষ হয়, সেই শক্তিটী যেন গড়াইয়া যাইতেছে, এই ভাব প্রকাশ করে। প্রকৃত রূপে উচ্চারিত হইলে এই ওঙ্কার সমুদয় শব্দোচ্চারণ-ব্যাপারটীকে প্রকাশ করিবে—আর কোন শব্দই ইহা করিতে পারে না, সুতরাং উহাই স্ফোটের ঠিক উপযোগী বাচক—এই স্ফোটই ওঙ্কারের প্রকৃত বাচক। আর বাচক বাচ্য হইতে পৃথক্কৃত হইতে পারে না, সুতরাং এই ওঁ ও স্ফোট একই পদার্থ। আর এই স্ফোট ব্যক্ত জগতের সূক্ষ্মতমাংশ বলিয়া ব্রহ্মের খুব নিকটবর্ত্তী। অতএব, উহা ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ। সুতরাং ওঙ্কারই ঈশ্বরের প্রকৃত বাচক। আর সেই একমাত্র অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে যেমন অপূর্ণ জীবাত্মাগণ বিশেষ বিশেষ ভাবে ও বিশেষ বিশেষ গুণযুক্তরূপে চিন্তা করিতে পারে, সেইরূপ তাঁহার দেহস্বরূপ এই জগৎও সাধকের মনোভাবানুযায়ী ভিন্ন ভিন্নরূপে চিন্তা করিতে হইবে।

উপাসকের মনে যখন যে তত্ত্ব প্রবল থাকে, তখন

---

* অক্ষরাণামকারোঽস্মি।

গীতা, ১০ম অধ্যায়, ৩৩ শ্লোক।

তাহার সেই ভাবই উদয় হয়। ইহার ফল এই, একই ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন গুণপ্রাধান্যে দৃষ্ট হইবেন, আর সেই এক জগৎই ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা কম বিশিষ্ট ও সার্ব্বভৌমিক বাচক ওঙ্কারে যেমন বাচ্য ও বাচক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তদ্রূপ এই বাচ্য বাচকের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ভগবানের ও জগতের বিশেষ বিশেষ খণ্ড ভাব সম্বন্ধেও খাটিবে। আর ইহার সকল গুলিরই বিশেষ বিশেষ বাচক শব্দ থাকা আবশ্যক। মহাপুরুষদের গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতে উত্থিত এই বাচক শব্দ সমূহ যথাসম্ভব ভগবান ও জগতের সেই বিশেষ খণ্ড ভাবের প্রকাশ করে। যেমন ওঙ্কার সেই অখণ্ড ব্রহ্মকে প্রকাশ করে, এই মন্ত্রগুলিও সেই পরমপুরুষেরই খণ্ড ভাবগুলি প্রকাশ করে। উহারা সকলেই ভগবদ্ধ্যান ও প্রকৃত জ্ঞান লাভের সহায়।

প্রতীক ও প্রতিমা উপাসনা।

এইবারে প্রতীকোপাসনা ও প্রতিমাপূজার বিষয়ে চিন্তার সময় আসিল। প্রতীক অর্থে যে সকল বস্তু অল্প বিস্তর ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে উপাসনার যোগ্য। প্রতীকে ভগবদুপাসনার অর্থ কি? "ব্রহ্ম নয়, এমন বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া ব্রহ্মের অনুসন্ধান।" (১) ভগবান রামানুজ বলিয়াছেন,—"মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে, ইহা আধ্যাত্মিক; আকাশ ব্রহ্ম, ইহা আধিভৌতিক।" মন আধ্যাত্মিক ও আকাশ বাহ্য প্রতীক—এই উভয়কেই ব্রহ্মের

(১) অব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্ট্যা অনুসন্ধানম্।

বিনা[illegible]য় উপাসনা করিতে হইবে। এইরূপ, " 'আদিত্যই ব্রহ্ম ইহাই আদেশ' * * * 'যিনি নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন,' ইত্যাদি ইত্যাদিস্থলে প্রতীকোপাসনা সম্বন্ধে সংশয় হয়," শঙ্করাচার্য্য এইরূপ বলিয়াছেন। প্রতীক শব্দের অর্থ—বাহিরের দিকে যাওয়া, আর প্রতীকোপাসনা অর্থে ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে এমন এক বস্তুর উপাসনা, যাহা একাংশে অথবা অনেকাংশে ব্রহ্মের তুল্য সন্নিহিত—সন্নিহিত, কিন্তু ব্রহ্ম নহে। শ্রুতিতে বর্ণিত প্রতীকের ন্যায়, পুরাণ তন্ত্রেও অনেক প্রতীকের বর্ণনা আছে। সমুদয় পিতৃ-উপাসনা ও দেবোপাসনা এই প্রতীকোপাসনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

এক্ষণে কথা এই, ঈশ্বরকে এবং কেবল ঈশ্বরকে উপাসনার নামই ভক্তি। দেব, পিতৃ অথবা আর কিছুর উপাসনা, ভক্তি হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভূক্ত। উহা উপাসককে কেবল কোনপ্রকার স্বর্গভোগরূপ বিশেষ ফল প্রদান করে, কিন্তু উহাতে ভক্তির উদয় হয় না—উহা মুক্তিও প্রসব করিতে পারে না। সুতরাং একটী কথা বিশেষরূপ মনে রাখা আবশ্যক। কোন কোন স্থলে এরূপ সম্ভব যে, সেই সর্ব্বোচ্চ দার্শনিক আদর্শ পরমব্রহ্মকে প্রতীকোপাসক প্রতীকের সহিত সমান ভূমিতে টানিয়া আনিতে পারে, আর যদি প্রতীককেই উপাসকের আত্মস্বরূপে চিন্তা করা হয়, তাহা হইলে উপাসক সম্পূর্ণরূপে বিপথে চলিয়া যান। কারণ, কোন প্রতীকই উপাসকের আত্মা হইতে পারে না। কিন্তু, যেখানে ব্রহ্মই উপাস্য, আর প্রতীক কেবল উহার প্রতিনিধি স্বরূপ, অথবা উহার উদ্দীপক কারণ মাত্র, অর্থাৎ যেখানে প্রতীকের সহায়তায় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়,

সেখানে এইরূপ উপাসনা বিশেষ উপকারী। শুধু তাহাই নহে, প্রবর্ত্তকদিগের পক্ষে উহা একেবারে অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়। সুতরাং যখন কোন দেবতা অথবা অন্ত প্রাণীকে, ঐ দেবতা অথবা প্রাণিরূপেই উপাসনা করা হয়, তখন এরূপ উপাসনাকে একটী কর্ম্মকাণ্ড মাত্র বলা যাইতে পারে। আর উহা একটী বিদ্যা বলিয়া, ঐ বিশেষ বিদ্যার ফল যাহা, তাহা হইয়া থাকে। কিন্তু যখন কোন দেবতা অথবা অন্ত প্রাণী ব্রহ্মরূপে দৃষ্ট ও উপাসিত হয়, তখন উহা ঈশ্বরোপাসনার সহিত তুল্যফল হইয়া পড়ে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, অনেক স্থলে, শ্রুতি স্মৃতি উভয় স্থলেই, কোন দেবতা বা সাধু অথবা অন্ত কোন অদ্ভুত জীবকে তাহাদের নিজ স্বরূপ হইতে তুলিয়া লইয়া ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা হয় কেন। অদ্বৈতবাদী বলেন, 'নামরূপ তুলিয়া লইলে, সকল বস্তুই কি ব্রহ্ম নহে?' বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন, 'সেই প্রভুই কি সকলের অন্তরাত্মা নহেন?' শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন, "আদিত্যাদির উপাসনার ফল ব্রহ্মই দেন, কারণ তিনিই সকলের অধ্যক্ষ। যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণু আদির আরোপ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মও প্রতীকে আরোপিত হন।" *

প্রতীক সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, প্রতিমা সম্বন্ধেও সেই সকল কথা খাটিবে, অর্থাৎ যদি প্রতিমা কোন দেবতা

---

* ফলমাদিত্যাদ্যুপাসনেষু ব্রহ্মৈব দাস্যতি সর্ব্বাধ্যক্ষত্বাৎ। ঈদৃশং চাত্র ব্রহ্মণঃ উপাস্যত্বং যতঃ প্রতীকেষু তদ্দৃষ্ট্যাধ্যারোপণং প্রতিমাদিষু ইব বিষ্ণ্বাদীনাং।

ব্রহ্মসূত্র শঙ্করভাষ্য।

না সাধু সূচক হয়, তাহা হইলে সেইরূপ উপাসনাকে ভক্তি বলা যাইবে না, সুতরাং উহা হইতে মুক্তিলাভও হইবে না। কিন্তু উহারা সেই এক ঈশ্বরের সূচক হইলে, উহারা ভক্তি মুক্তি উভয়ই প্রসব করে। জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মগুলির মধ্যে বেদান্ত, বৌদ্ধধর্ম্ম ও খ্রীষ্টধর্ম্মের কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রতিমা পূজা সম্বন্ধে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। বরং তাঁহারা অবাধে প্রতিমার সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন; কেবল মুসলমান ও প্রোটেষ্টাণ্টধর্ম্ম এই সহায়তার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। তাহা হইলেও মুসলমানেরা তাঁহাদের সাধু ও ধর্ম্মার্থে প্রাণোৎসর্গী ব্যক্তিগণের কবর একরূপ প্রতিমা স্থলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রোটেষ্টাণ্টরা ধর্ম্মে বাহ্য সহায়তার আবশ্যকতা উড়াইয়া দিতে গিয়া, প্রতিদিন ক্রমশঃ উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। আর আজকাল, খুব উন্নত প্রোটেষ্টাণ্টের সহিত, কেবল নীতিমাত্রবাদী অগষ্ট কমতের চেলা ও অজ্ঞেয়বাদীদের কোন প্রভেদ নাই। আর খ্রীষ্ট বা মুসলমান ধর্ম্মে প্রতিমা পূজার যে টুকু অবশিষ্ট আছে, সে টুকু কেবল তাহাই, যাহাতে প্রতীক বা প্রতিমমাত্রই উপাসিত হয়, ব্রহ্মদৃষ্টিসৌকর্য্যার্থে নহে। সুতরাং, উহা ঘোর কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গতমাত্র। সুতরাং উহা হইতে মুক্তি বা ভক্তি কিছুমাত্র হইতে পারে না। এইরূপ প্রতিমা পূজাতে আত্মা ঈশ্বরভিন্ন অন্য বস্তুতে আত্মসমর্পন করেন, সুতরাং প্রতিমা, কবর, মন্দির ইত্যাদির এইরূপ ব্যবহারকেই প্রকৃত পুত্তলপূজা বলা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও উহা কোন পাপকর্ম্ম নহে বা অন্যায় নহে। উহা একটী কর্ম্মমাত্র—উপাসকেরা উহার ফল পাইয়াও থাকেন।

ইষ্টনিষ্ঠা।

তারপর, আর একটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন—ইষ্টনিষ্ঠা। যে ভক্ত হইতে চাহে তাহার জানা উচিত—'মত পথ' ... তাহার জানা উচিত, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় সেই একই ভগবানের মহিমার বিকাশ মাত্র। "লোকে তোমাকে কত বিভিন্ন নামে ডাকিয়া থাকে। লোকে তোমাকে বিভিন্ন নামে যেন ভাগ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ঐ প্রত্যেক নামেই যেন তোমার সর্ব্বশক্তিমত্তা রহিয়াছে। এই সমুদয় উপায়গুলি দ্বারাই তুমি উপাসকের নিকট প্রকাশিত হও। তোমার প্রতি আত্মার ঐকান্তিক অনুরাগ থাকিলে, তোমাকে ডাকিবারও কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। তোমার নিকট এত সহজে যাওয়া যায়, কিন্তু আমার দুর্দ্দৈব, তোমার প্রতি আমার অনুরাগ জন্মিল না।" * শুধু ইহাই নহে, ভক্তেরা যেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাতেজস্বী জ্যোতির তনয়গণকে ঘৃণা, এমন কি, তাঁহাদের দোষদৃষ্টি বিষয়েও বিশেষ সতর্ক থাকেন, তাঁহাদের দোষোদ্ঘোষণ তাঁহাদের শুনা পর্য্যন্ত উচিত নয়। অবশ্য এমন লোক অতি অল্পই আছেন, যাঁহারা একেবারে মহা উদারতা সম্পন্ন ও অপরের গুণনিরীক্ষণে সমর্থ অথচ গভীরপ্রেমসম্পন্ন। সচরাচর দেখা

---

* নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি
তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

শ্রীচৈতন্যের উক্তি।

যায়, উহার সম্প্রদায় সমস্ত প্রেমের গভীরতা হারাইয়া ফেলে। তাহাদের নিকট ধর্ম্ম একরূপ রাজনৈতিক-সামাজিক সভারূপে পরিণত হয়। আবার খুব সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকগণ নিজেদের ইষ্টের প্রতি খুব প্রেমসম্পন্ন বটে, কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী সকলের প্রতি ভয়ানক ঘৃণাসম্পন্ন হইয়াই, তাহাদের এই প্রেম লাভ করে। ঈশ্বর করুন, যেন জগৎ পরম উদার অথচ গভীর প্রেম-সম্পন্ন জনগণে পূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু এরূপ মহাত্মার সংখ্যা অতি অল্প এবং তাঁহারা অনেক দিন অন্তর অন্তর জন্মগ্রহণ করেন। তাহা হইলেও আমরা জানি, আমরা জগতের অনেক লোককে এইরূপ গভীরতা ও উদারতার অপূর্ব্ব মিশ্রিত ভাব শিখাইতে পারি। আর ইহার উপায় এই ইষ্টনিষ্ঠা। সকল ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায় মানুষকে কেবল একটী মাত্র আদর্শ দেখাইয়া দেয়। কিন্তু সনাতন বৈদান্তিক ধর্ম্ম ভগবানের সেই মন্দিরে প্রবেশ করিবার অনন্ত দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন ও মানবের সম্মুখে এরূপ অফুরন্ত আদর্শরাশি রাখিয়া দিয়াছেন। তাহার সকল গুলিই সেই অনন্তস্বরূপের এক একটী বিকাশমাত্র। করুণাবশে ব্যগ্র হইয়া বেদান্ত, অতীত ও বর্ত্তমানে মহিমান্বিত ঈশ্বর-তনয় বা ঈশ্বরের মানবীয় অবতারগণের দ্বারা মানবজীবনের সত্যরূপ পর্ব্বতে খনিত বিভিন্ন পথে মুমুক্ষু নরনারীগণকে আহ্বান করিতেছেন, আর বাহু প্রসারিত করিয়া সকলকে, এমন কি, ভবিষ্যদ্বংশীয়গণকে পর্য্যন্ত সেই সত্যের গৃহ ও আনন্দের সমুদ্রে আহ্বান করিতেছেন, যেখানে মানবাত্মা মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও অনন্ত আনন্দের ভাবে বিহ্বল হইতে পারে।

অতএব ভক্তিযোগ ভগবৎ-প্রাপ্তির বিভিন্ন পথগুলির কোন-

টাকে ঘৃণা করিতে অথবা অস্বীকার করিতে একেবারে নিষেধ করেন। তথাপি যতদিন গাছ ছোট থাকে, ততদিন বেড়া দিয়া রাখিতে হয়। একেবারে নানা প্রকার ভাব ও আদর্শ সম্মুখে রাখিলে ধর্ম্মের মৃদু লতা মরিয়া যাইতে পারে। অনেক লোকে ধর্ম্মে উদার ভাবের নামে অনবরত ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া আপনাদের আলস্য-জনিত কৌতূহল মাত্র চরিতার্থ করে। তাদের পক্ষে নূতন ভাব শুনা যেন একরূপ ব্যারাম—একরূপ পাগলামির ভিতর দাঁড়ায়। তারা খানিকটা সাময়িক স্নায়বীয় উত্তেজনা চায়, সেটা চলিয়া গেলেই তারা আর একটার জন্য প্রস্তুত হয়। ধর্ম্ম তাদের পক্ষে যেন আফিমের নেশার মত হইয়া দাঁড়ায়, আর ঐ স্থানেই উহার শেষ। ভগবান রামকৃষ্ণ বলিতেন, "আর এক প্রকারের লোক আছেন—তাঁরা শুক্তির ন্যায়। স্বাতি নক্ষত্র তুঙ্গস্থ থাকিতে তারা সমুদ্রের তলা ছাড়িয়া জলের উপর আসিয়া ভাসে। খোলাটী খুলিয়া সমুদ্রের উপর বিচরণ করে, যতদিন না এক বিন্দু বৃষ্টির জল পায়। এই এক ফোঁটা জল পাইলেই তারা একেবারে সমুদ্রের অতল তলে নামিয়া যায়, আর ততদিন তথায় থাকে, যতদিন না এই বৃষ্টি জল হইতে একটী সুন্দর মুক্তা প্রস্তুত করিতে পারে।"

এই উদাহরণে ইষ্টনিষ্ঠা ভাবটী খুব জোরের সহিত ও কবিত্বের ভাবে কথিত হইয়াছে। প্রবর্ত্তকের পক্ষে এই একনিষ্ঠা বিশেষ রূপে আবশ্যক। রামায়ণে বর্ণিত হনুমানের মত তাঁহার জানা উচিত যে, "যদিও লক্ষ্মীপতি ও সীতাপতি একই, তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব।" * অথবা সাধু তুলসীদাসের

---

* শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ॥

মত হওয়া উচিত—"সকলের সহিত বৈস, সকলের সহিত আনন্দ কর, সকলের নামগ্রহণ কর। সকলকেই হাঁ, হাঁ বল, কিন্তু নিজের ভাব দৃঢ় রাখিও।" * তাহা হইলেই যদি ভক্ত সাধক প্রকৃত অকপট হন, এই ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃহৎ বট উৎপন্ন হইয়া ধর্ম্মের সমুদয় ক্ষেত্র তাহার শাখা প্রশাখা ও শিকড়ে ছাইয়া ফেলিবে। তাহা হইলেই প্রকৃত ভক্ত দেখিবেন, তাঁহার নিজেরই ইষ্ট দেবতা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে, ভিন্ন নামে, ভিন্ন রূপে উপাসিত।

ভক্তির সাধন।

ভক্তিলাভের উপায় ও সাধন সম্বন্ধে ভগবান রামানুজের বেদান্ত-ভাষ্যে পাই—

'বিবেক, ইন্দ্রিয়জয়, অভ্যাস, যজ্ঞ, শুচিতা, বল ও অনুদ্ধর্ষ হইতে ভক্তিলাভ হয়।' বিবেক অর্থে রামানুজের মতে শুধু অন্যান্য বিষয়ের বিচার নহে, আহারেরও শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার। তাঁহার মতে আহার তিন কারণে অপবিত্র হইয়া থাকে। (১ম)—খাদ্যের স্বভাব হইতে, যেমন রশুন, পেঁয়াজ প্রভৃতি। (২য়)—দুষ্ট ও অভিশপ্ত ব্যক্তিগণের সংস্পর্শ হেতু। (৩য়)—বাহিরের অশুচি বস্তুর

---

* সব্‌সে বসিয়ে সব্‌সে রসিয়ে সব্‌কা লিজিয়ে নাম।
হাঁজি হাঁজি কর্‌তে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম॥
তুলসী কৃত দোঁহা।

সংস্পর্শে, যেমন কেশ, ধূলি আদির সংস্পর্শ হেতু। শ্রুতি বলেন,
"যখন আহার শুদ্ধ হয়, তখন চিত্তও শুদ্ধ হয়, স্মৃতি অচল হয়।" *
রামানুজ ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে এই শ্লোক উদ্ধার
করিয়াছেন।

এই খাদ্যাখাদ্য-বিচার চিরকালই ভক্তদিগের মতে একটী অতি
গুরুতর বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অনেক ভক্তিসম্প্র-
দায় এ বিষয়টীকে অনেক অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন বটে,
কিন্তু এই খাদ্যাখাদ্য বিচারের মধ্যে একটী গুরুতর সত্য অন্ত-
নিহিত আছে। আমাদের মনে রাখা উচিত, সাংখ্য দর্শনের
মতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, যাহাদের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি ও যাহারা
বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এই জগদ্রূপে পরিণত হয়, তাহারা
প্রকৃতির উপাদান এবং গুণও বটে। সুতরাং ঐ সমুদয় উপাদান
হইতেই প্রত্যেক নরদেহ নির্ম্মিত হইয়াছে, আর এই সত্ত্ব পদার্থের
প্রাধান্যই আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। আমরা
খাদ্যের দ্বারা শরীরের ভিতর যে উপাদান গ্রহণ করি, তাহাতে
আমাদের মানসিক গঠনের অনেক সাহায্য হয়, সুতরাং আমা-
দের খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। যাহাই
হউক, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও শিষ্যেরা চিরকাল যেরূপ
গোঁড়ামী করিয়া থাকে, তাহা যেন গুরুদের স্কন্ধে আরোপিত না
হয়।

যাহা হউক, এই আহারসম্বন্ধীয় বিচার কেবল গৌণ মাত্র।
পূর্ব্বোদ্ধৃত ঐ বাক্যটীই শঙ্কর তাঁহার উপনিষদ্-ভাষ্যে অন্যরূপে

---

* আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।
ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭মপ্রঃ, ২৬ খণ্ড।

ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ বাক্যস্থ 'আহার' শব্দটী যাহা সচরাচর খাদ্য অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা তিনি অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'যাহা আহৃত হয়, তাহাই আহার। শব্দাদি বিষয়সমূহ ভোক্তা অর্থাৎ আত্মার উপভোগের জন্য ভিতরে আহৃত হয়। এই বিষয়ানুভূতিজ জ্ঞান সমূহের শুদ্ধিকে আহার-শুদ্ধি বলে। সুতরাং আহারশুদ্ধি অর্থে আসক্তি, দ্বেষ বা মোহ-শূন্য হইয়া বিষয়-জ্ঞানের গ্রহণ। সুতরাং এইরূপ জ্ঞান অর্থাৎ আহার শুদ্ধ হইলে এইরূপ ব্যক্তির সত্ত্ব অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় শুদ্ধ হইয়া যাইবে। সত্ত্বশুদ্ধি হইলে স্বরূপে জ্ঞাত অনন্ত পুরুষের অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি আসিবে।'' *

এ দুটী ব্যাখ্যা আপাতবিরোধী বলিয়া বোধ হইলেও উভয়টীই সত্য ও আবশ্যকীয়। সূক্ষ্ম শরীর বা মনের সংযম মাংসপিণ্ডময় স্থূল শরীরের সংযম হইতে উচ্চতর কার্য্য বটে, কিন্তু সূক্ষ্মের সংযম করিতে হইলে অগ্রে স্থূলের সংযম করা বিশেষ আবশ্যক। অতএব প্রবর্ত্তকের পক্ষে তাঁহার গুরুপরম্পরায় খাদ্য সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রচলিত আছে, সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কিন্তু আজ কাল আমাদের অনেক সম্প্রদায়ে যেরূপ অস্বাভাবিক

---

* আহ্রিয়তে ইত্যাহারঃ শব্দাদিবিষয়জ্ঞানম্। ভোক্তুর্ভোগায়াহ্রিয়তে তস্য বিষয়োপলব্ধিলক্ষণস্য বিজ্ঞানস্য শুদ্ধিরাহার-শুদ্ধীরাগদ্বেষমোহদোষৈরসংস্পৃষ্ট বিষয়বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ। তস্যা-মাহারশুদ্ধৌ সত্যাং তদ্বতোঽন্তঃকরণস্য সত্ত্বস্য শুদ্ধির্নৈর্ম্মল্যং ভবতি। সত্ত্বশুদ্ধৌ চ সত্যাং যথাবগতে ভূমাত্মনি ধ্রুবাবিচ্ছিন্না স্মৃতিরবিস্মরণং ভবতি। ছান্দোগ্য উপনিষদ-৭মপ্রপাঠক, ২৬শ খণ্ডের শাঙ্করভাষ্য।

অর্থহীন গোঁড়ামী দেখা যায়, যাহাতে ধর্ম্মের মহৎ সত্য-সমূহে আধ্যাত্মিকতার সূর্য্যালোক পড়িতে না দিয়া উহাদিগকে রন্ধন-শালায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তাহা এক বিশেষ প্রকারের খাঁটি জড়বাদ মাত্র। উহা জ্ঞানও নহে, ভক্তিও নহে, কর্ম্মও নহে। উহা এক প্রকারের উন্মত্ততা মাত্র। যাহাদের আত্মা ঐ বিষয়ে ভয়ানক আসক্ত, তাহাদের ব্রহ্মলোকে গতি না হইয়া বাতুলালয়েই গতি অধিক সম্ভব। সুতরাং ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে যে, আহার-সম্বন্ধে বিচার মনের স্থিরতারূপ উচ্চাবস্থা লাভের জন্ম বিশেষ আবশ্যক। অন্য উপায়ে ঐরূপ মানসিক উন্নতিলাভ অসম্ভব। তার পর ইন্দ্রিয়-সংযম। ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়াভিমুখী গতি নিবারণ ও উহাদিগকে সংযম করিয়া নিজ ইচ্ছার অধীনে আনয়নই সকল ধর্ম্মসাধনেরই কেন্দ্রস্বরূপ। তারপর আত্মসংযম ও আত্মত্যাগের অভ্যাস। আত্মার যে পরমাত্মানুভূতির অনন্ত সম্ভবনীয়তা রহিয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করা সাধকের দিনের চেষ্টা ও এইরূপ তীব্র অভ্যাস ব্যতীত হইতে পারে না। "মন যেন সর্ব্বদাই সেই ঈশ্বরের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকে।" প্রথম প্রথম মনকে সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তায় নিবিষ্ট রাখা অতি কঠিন বোধ হয়। কিন্তু প্রত্যেক বার চেষ্টার সহিত এই চিন্তার শক্তি ক্রমশঃ আইসে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, 'হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ইহা লব্ধ হইয়া থাকে।' * আর যজ্ঞ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে, পঞ্চ মহাযজ্ঞ যেন নিয়মিতরূপে অনুষ্ঠান করা হয়।

পবিত্রতারূপ ভিত্তির উপর ভক্তিগৃহ প্রতিষ্ঠিত। বাহ্য শৌচ

---

* অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।

গীতা, ৬ অঃ, ৩৫ শ্লোক।

অথবা প্রাহার সম্বন্ধে বিচার এ উভয়ই সহজ, কিন্তু অন্তঃশুদ্ধি ব্যতিরেকে উহাদের আর কোন ফল নাই। রামানুজ পবিত্রতা লাভের উপায়-স্বরূপ নিম্নলিখিত গুণগুলির কথা বর্ণনা করিয়াছেন—সত্য, আর্জ্জব—সরলতা, দয়া—নিঃস্বার্থ পরোপকার, অহিংসা—কায়মনোবাক্যে অপরের প্রতি হিংসা না করা, অভিধ্যা—অপরের জিনিষে লোভ না করা, বৃথা চিন্তা না করা ও অপরে কোন অনিষ্ট করিলে সেই বিষয়ে ক্রমাগত চিন্তা না করা। ইহার মধ্যে অহিংসা ভাবটীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা উচিত। এই অহিংসা ভাব সকল প্রাণী সম্বন্ধেই অবলম্বন আবশ্যক। কাহারও কাহারও মতানুযায়ী উহা কেবল মনুষ্য জাতির প্রতি দয়া ও অন্যান্য প্রাণীদিগের প্রতি নির্ম্মমতা নহে। আবার কাহারও কাহারও মতানুযায়ী কুক্কুর বিড়াল লালন পালন বা পিপীলিকাকে চিনি দিয়া অপর ভ্রাতার গলা কাটিবার স্বাধীনতা দেওয়াও নহে। ইহা একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় যে, জগতের সকল ভাল জিনিষই বাড়াবাড়ি করিলে বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। কোন সংবাদ লইয়া খুব বাড়াবাড়ি করিয়া যদি একেবারে নিয়মের রেখামাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া পালন করা যায়, তবে তাহাই একটী স্পষ্ট দোষ হইয়া দাঁড়ায়। কতকগুলি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অপরিষ্কার সন্ন্যাসীরা পাছে তাহাদের গায়ের পোকা মরিয়া যায়, এই ভয়ে স্নান করে না, কিন্তু তাহারা তাহাদের স্বজাতি মনুষ্যের নিকট যে অসুখ আনয়ন করে, সে বিষয়ে মোটেই দৃষ্টি করে না। তবে ইহারা বৈদিক-ধর্ম্মাবলম্বী নহে।

অহিংসার পরীক্ষা—ঈর্ষাশূন্যতা। যে কোন লোক সাময়িক উত্তেজনায় অথবা কোন কুসংস্কার বা পুরোহিতের বশবর্ত্তী হইয়া কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারে, অথবা কোনরূপ দান করিতে

পারে, কিন্তু যিনি যথার্থ লোকপ্রেমিক, তিনি কাহার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হন না। জগতে যাঁহাদিগকে বড় লোক বলিয়া থাকে, তাঁহারা সামান্য নাম, একটু যশ এবং দু এক টুকরা স্বর্ণখণ্ডের জন্য পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া থাকেন। যতদিন অন্তরে এই ঈর্ষ্যার ভাব থাকে, ততদিন অহিংসায় পূর্ণতা হইতে পারে না। গরুও মাংস খায় না, ভেড়াও খায় না, তবে কি তাহারা বড় যোগী—বড় অহিংসক? যে কোন মূর্খ এ খাওয়া ও খাওয়া ছাড়িতে পারে। তাহাতে তাহাকে উদ্ভিদ্‌ভোজী জন্তু হইতে কি পৃথক্ করিতে পারে? যে লোক নির্দ্দয়ভাবে বিধবা ও অনাথ বালক বালিকাকে ঠকাইয়া লইতে পারে, আর টাকার জন্য মহা অন্যায় কার্য করিতে পারে, সে কেবল ঘাস খাইয়া জীবনধারণ করিলেও পশু হইতে অধম। যে ব্যক্তির হৃদয় কখন কাহারও প্রতি অসদ্ভাব পোষণ করে না, যিনি পরম শত্রুর সৌভাগ্যেও আনন্দিত, সে ব্যক্তি সমুদয় জীবন শূকর-মাংস খাইয়া জীবনধারণ করিলেও সেই প্রকৃত ভক্ত, সেই প্রকৃত যোগী, সেই সকলের গুরু। সুতরাং এইটী স্মরণ রাখা উচিত যে, বাহ্য ক্রিয়াকলাপ কেবল আন্তরিক পবিত্রতা জন্মিয়া দিবার সহায়ক। যেখানে বাহ্য বিষয়ে অত খুঁটিনাটি বিচার করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, সেখানে কেবল অন্তঃশৌচ অবলম্বনই যথেষ্ট। সেই লোককে ধিক্, সেই জাতিকে ধিক্, যে লোক, যে জাতি ধর্ম্মের প্রকৃত সার ভুলিয়া অভ্যাসবশে বাহ্য অনুষ্ঠানগুলিকে মরণ কামড়ে ধরিয়া থাকে, কোন মতে ছাড়িতে চাহে না। বাহ্য অনুষ্ঠানগুলির দ্বারা যদি আন্তরিক আধ্যাত্মিক ভাবগুলি ব্যক্ত হয়, তবেই উহাদের উপযোগিতা আছে বলিতে হইবে। আধ্যাত্মিকভাবপ্রকাশক না হইলে উহাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে উৎপাটন করিয়া ফেল।

ভক্তিলাভের জন্য তার পর আবশ্যক—অনবসাদ—বল। শ্রুতি বলেন, "বলহীন লোকে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না।"* এখানে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার দৌর্ব্বল্যই লক্ষিত হইয়াছে। "বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ" ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্যের উপযুক্ত। ক্ষুদ্রকায়, বদ্‌খত, জীর্ণ শীর্ণ ব্যক্তি কি করিবে? শরীর ও মনের অভ্যন্তরবর্ত্তী অদ্ভুত শক্তিসমূহ যদি কোনরূপ যোগাভ্যাসের দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও জাগরিত হয়, তখনি তাহারা একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে। "যুবা, সুস্থকায়, সবল" ব্যক্তিই সিদ্ধ হইতে পারেন, সুতরাং শারীরিক বল অত্যাবশ্যক। ইন্দ্রিয়সংযমজনিত প্রতিক্রিয়া খুব সবল দেহই সহ্য করিতে পারে। ভক্ত হইতে যাঁহার সাধ, তাঁহার সবল সুস্থকায় হওয়া আবশ্যক। যাহারা অতি দুর্ব্বল, তাহারা যদি কোনরূপ যোগাভ্যাসের চেষ্টা করে, তবে হয় তাহারা কোন অচিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত হইবে, নতুবা মনকে ভয়ানক দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে। ইচ্ছা করিয়া শরীরকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলা অধ্যাত্মতত্ত্বানুভূতির একটী অত্যাবশ্যকীয় উপাদান নহে।

যাহার চিত্ত দুর্ব্বল, সেও আত্মলাভে কৃতকার্য্য হয় না। যে ভক্ত হইতে ইচ্ছুক, তাহার সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকা আবশ্যক। পাশ্চাত্য জগতে আদর্শ ধার্ম্মিকের লক্ষণ এই—সে কখনও হাসিবে না, তাহার মুখের উপর কালো মেঘ সর্ব্বদা ছাইয়া থাকিবে। তাহার উপর তাহার চোয়াল বসা ও মুখ লম্বা হওয়া আবশ্যক। শুক্‌নো শরীর ও লম্বা-মুখ লোক ভিষকের যত্ন লই-

---

* নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩য় মু, ২য় খঃ, শ্লোঃ ৪।

বার জিনিষ বটে, কিন্তু তাহারা যোগী নহে। সত্ত্বাসপূর্ণ ব্যক্তিই অধ্যবসায়শীল। দৃঢ়চেতা লোকই অসংখ্য বিপদ্ রাশির মধ্য দিয়া পথ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে। আর এই মায়ার দুর্ভেদ্য জাল ভেদ করা রূপ মহা কঠোর কার্য্য কেবল মহাবীরগণের জন্যই রহিয়াছে।

কিন্তু তাহা বলিয়া অসঙ্গত আমোদে মাতিলে চলিবে না (অনুদ্ধর্ষ)। অতিরিক্ত হাস্য কৌতুক আমাদিগকে গভীর চিন্তায় অক্ষম করিয়া ফেলে। উহাতে মানসিক শক্তিসমূহের বৃথা ক্ষয় হয়। ইচ্ছাশক্তি যত দৃঢ় হয়, ভাবের বশে উহা তত কম বিচলিত হয়। বেশী দুঃখজনক গম্ভীর ভাব যেমন খারাপ, অতিরিক্ত আমোদও তদ্রূপ। যখন মন সামঞ্জস্যপূর্ণ, স্থির শান্ত ভাবে থাকে, তখনই সমুদয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্ভব।

এইরূপেই লোকে ভগবানকে ভালবাসিতে শিখে।

পরাভক্তি—ত্যাগ।

এক্ষণে আমরা গৌণী ভক্তির কথা শেষ করিয়া পরাভক্তির আলোচনা আরম্ভ করিলাম। আমাদের এই পরাভক্তি অভ্যাসে প্রস্তুত হইবার একটী বিশেষ সাধনের কথা বলিতে হইবে। এই সমুদয় আয়োজনই কেবল আত্মশুদ্ধির জন্য বিহিত। পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণ, ক্রিয়াকাণ্ড, প্রতিমাদি সমুদায়ই কেবল আত্মার শুদ্ধিসাধনের জন্য। ত্যাগই ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধিকর—উহা

ব্যতীত লোকে এই পরাভক্তির রাজ্যে প্রবেশই করিতে পারে না। অনেকের পক্ষে ইহা ভয়ানক বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহা ব্যতীত কোন আধ্যাত্মিক উন্নতিই হইতে পারে না। সকল যোগেই এই ত্যাগ আবশ্যক। এই ত্যাগই ধর্ম্মের সোপান—সমুদয় সাধনের অন্তরঙ্গ সাধন। সমুদয় ধর্ম্মই এই ত্যাগ। যখন মানবাত্মা সংসারের সমুদয় বস্তু হইতে আপনাকে সরাইয়া লয়, ও গভীর তত্ত্বসমূহ অনুসন্ধান করিতে যায়, যখন আত্মা বুঝিতে পারে, আমি দেহরূপ জড়ে বদ্ধ হইয়া জড় হইয়া যাইতেছি, বুঝিয়াই জড় পদার্থ হইতে আপনার দৃষ্টি সরাইয়া লয়, তখনই ত্যাগ আরম্ভ হয়, তখনই প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি আরম্ভ হয়। কর্ম্মযোগীর ত্যাগ—সমুদয় কর্ম্মফল ত্যাগ। তিনি যে সকল কর্ম্ম করেন, তাহার ফলে আসক্ত হন না। তিনি ঐহিক বা পারত্রিক কোন লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হন না। রাজযোগী বুঝেন, সমুদয় প্রকৃতি কেবল আত্মার পক্ষে নানাবিধ ভোগপ্রাপ্তির জন্য, আর আত্মার এই নানাবিধ ভোগের ফল—প্রকৃতি হইতে তাঁহার নিত্য স্বতন্ত্রত্ব জানা। মানবাত্মাকে জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে—তিনি অনন্তকালের জন্য আত্মাই ছিলেন, আর ভূতের সহিত তাঁহার সংযোগ কেবল সাময়িক—ক্ষণিক। রাজযোগী নিজে প্রকৃতিকে দেখিয়া, ঠেকিয়া বৈরাগ্য শিখেন। জ্ঞানযোগীকে সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর বৈরাগ্যের মধ্য দিয়া যাইতে হয়; কারণ প্রথম হইতেই এই সত্যবৎপ্রতীয়মান প্রকৃতিকে তাঁহাকে মিথ্যা বলিয়া জানিতে হয়। তাঁহাকে বুঝিতে হয়, প্রকৃতির বিভিন্ন বিকার বলিয়া যাহা কিছু দেখিতেছি, সবই আত্মার—প্রকৃতির নহে। তাঁহার প্রথম হইতেই জানিতে হয়, আত্মাতেই সমুদয় জ্ঞান ও অনুভূতি রহিয়াছে, প্রকৃতিতে কিছুই

নাই। সুতরাং তাঁহাকে একেবারে কেবল বিচারজনিত ধারণার বলে সমুদয় প্রাকৃতিক বন্ধন হইতে আপনাকে ছিন্ন করিতে হয়। তিনি প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সমুদয় পদার্থকে উড়িয়া যাইতে দিয়া নিজে পৃথক্ থাকিতে চেষ্টা করেন।

সকল প্রকার বৈরাগ্য অপেক্ষা ভক্তিযোগীর বৈরাগ্য খুব স্বাভাবিক। ইহাতে কোন কঠোরতা নাই, কিছু ত্যাগ করিতে হয় না, নিজের ভিতর হইতে কোন জিনিষ ছিঁড়িয়া লইতে হয় না—কোন কিছু হইতে জোর করিয়া আমাদিগকে তফাত করিতে হয় না। ভক্তের ত্যাগ অতি সহজ—অতি স্বাভাবিক। আমরা এইরূপ ত্যাগ অন্ততঃ বিকৃতিরূপে আমাদের চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাইতেছি। কোন লোক কোন স্ত্রীলোককে ভালবাসে। কিছুদিন বাদে আর একজনকে ভালবাসিল। তখন ঐ প্রথম স্ত্রীলোকের ভাব তাহার মন হইতে চলিয়া গেল। তাহার মন হইতে উহার ভাব অতিধীরভাবে ক্রমশঃ সহজে অপহৃত হইয়া গেল। তাহাকে আর সেই স্ত্রীলোকের অভাব সহ্য করিতে হইল না। কোন স্ত্রীলোক কোন পুরুষকে ভালবাসিতেছে। সে আবার যখন অপর এক পুরুষকে ভালবাসে, তখন এই প্রথম পুরুষটী যেন তাহার মন হইতে সহজেই চলিয়া যায়। কোন লোক হয়ত, নিজের সহরকে ভালবাসে। ক্রমশঃ সে নিজের দেশকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিল। তখন নিজের সহরের জন্য যে প্রগাঢ় ভালবাসা, তাহা স্বভাবতই চলিয়া গেল। আবার ধর, কোন লোক সমুদয় জগৎকে ভালবাসিতে শিখিল। তখন তাহার স্বদেশানুরাগ—নিজ দেশের জন্য প্রবল উন্মত্ত ভালবাসা চলিয়া যায়। তাহাতে তাহার কিছু কষ্ট হয় না। ঐ ভাব তাড়াইবার জন্য

তাহাকে কিছু জোর জবরদস্ত করিতে হয় না। অশিক্ষিত লোক ইন্দ্রিয়সুখে উন্মত্ত। শিক্ষিত হইতে থাকিলে সে জ্ঞান-চর্চায় অধিক সুখ পাইতে থাকে। তখন সে ইন্দ্রিয়বিষয়ে তত সুখ পায় না। কুকুর ব্যাঘ্র খাদ্য পাইলে যেরূপ স্ফূর্ত্তির সহিত ভোজন করিতে থাকে, কোন মানুষের পক্ষে সেরূপ স্ফূর্ত্তির সহিত ভোজন সম্ভবপর নহে। আবার মানুষ বুদ্ধিবলে নানাবিষয় জ্ঞাত হইয়া ও নানা কার্য্য সম্পাদন করিয়া যে সুখ অনুভব করে, কুকুর তাহা কখন অনুভব করিতে পারে না। প্রথমে ইন্দ্রিয় হইতে সুখানুভূতি হইয়া থাকে। কিন্তু যখন পশু আর একটু উচ্চাবস্থায় চলিয়া যায়, তখন এই নিম্নজাতীয় সুখ কম তীব্র হইয়া দাঁড়ায়। মনুষ্যসমাজের মধ্যে দেখা যায়, মানুষ যতই পশুর তুল্য হয়, সে ইন্দ্রিয়সুখ ততই প্রবলভাবে উপলব্ধি করে। আর যতই তাহার শিক্ষাদির উন্নতি হয়, ততই বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ও এতদ্বিধ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে তাহার সুখানুভূতি হইতে থাকে। এইরূপ যখন আবার মানুষ বুদ্ধিরও উপরে চলিয়া যায়, শুধু মনোবৃত্তি হইতেও উচ্চতর ভূমিতে চলিয়া যায়, যখন সে আধ্যাত্মিকতা ও ভগবত্তত্ত্বানুভূতির ভূমিতে চলিয়া যায়, তখন সে এমন এক আনন্দের অবস্থা লাভ করে, যাহার সহিত তুলনায় ইন্দ্রিয় অথবা বুদ্ধিবৃত্তি-পরিচালনা জনিত সুখ শূন্য-স্বরূপে প্রতিভাত হয়। যখন চন্দ্র উজ্জ্বল ভাবে কিরণ মালা বিকিরণ করেন, তখন তারাগণ নিষ্প্রভ হইয়া যায়। আবার তপনের প্রকাশ হইলে চন্দ্রও নিষ্প্রভ ভাব ধারণ করে। ভক্তির জন্য যে বৈরাগ্যের প্রয়োজন, তাহা কোন কিছুকে নাশ করিয়া উৎপন্ন হয় না। যেমন খুব প্রবল আলোকের নিকট অল্পোজ্জ্বল

আলোক ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইতে নিষ্প্রভতর প্রতীত হয়,—পরিশেষে একেবারে অন্তর্হিত হয়, তদ্রূপ ভগবৎপ্রেমোন্মত্ততায় ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিজনিত সুখসমূহ নিষ্প্রভ হইয়া যায়। এই ঈশ্বরপ্রেম ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া এমন এক ভাব ধারণ করে, যাহাকে পরাভক্তি কহে। তখনই এই প্রেমিক পুরুষের পক্ষে অনুষ্ঠান কোথায় চলিয়া যায়, শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন থাকে না, প্রতিমা, মন্দির, ভজনালয়, নানাবিধ ধর্ম্ম, সম্প্রদায়, দেশ, জাতি, এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ভাব ও আসক্তি আপনা হইতেই চলিয়া যায়। কিছুতেই তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না, কিছুতেই তাঁহার স্বাধীনতা নষ্ট করিতে পারে না। জাহাজ হঠাৎ চুম্বক প্রস্তরের পাহাড়ের নিকট আসিলে উহার মধ্যবর্ত্তী পিন ও পাতগুলি সব আকৃষ্ট হইয়া পড়ে আর তক্তাগুলি খুলিয়া পড়িয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে। ভগবৎকৃপা এইরূপে সমুদয় বন্ধনকারী ভাব আত্মার স্বরূপ-প্রকাশের বিঘ্নগুলি অপসারিত করিয়া দেয়। তখন উহা মুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং ভক্তির সহায়ক এই বৈরাগ্যে কোন কঠোরতা নাই, কোন কর্কশ ভাব নাই, কোন শুষ্কভাব নাই কোনরূপ চাপাচাপি নাই। ভক্তকে তাহার হৃদয়ের কোনরূপ ভাবকেই চাপিয়া রাখিতে হয় না। তিনি কেবল উহাকে প্রবল করিয়া ভগবানের দিকে ফিরাইতে চাহেন।

ভক্তের বৈরাগ্য প্রেমপ্রসূত।

প্রকৃতিতে আমরা সর্ব্বত্রই প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাই। সমাজের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ, সমস্তই প্রেমপ্রসূত আবার অসৎ পৈশাচিক ব্যাপারগুলিও সেই একই প্রেমভাবের

বিকৃত রূপ মাত্র। ইহা হইতেই পতিপত্নীর বিশুদ্ধ দাম্পত্যপ্রেম এবং অতি নীচ কামবৃত্তিও উৎপন্ন হয়। ভাব একই, তবে বিভিন্ন অবস্থায় উহার বিভিন্নরূপ। সেই একই প্রেম প্রকৃত ভাবে প্রযুক্ত হইলে লোককে দরিদ্রকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করায়, আবার অপর ব্যক্তিকে নিজ ভ্রাতার গলা কাটিয়া তাহার সমুদয় বিষয় সম্পত্তি অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত করায়। শেষোক্ত ব্যক্তি নিজেকে যেমন ভালবাসে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপরকেও সেইরূপ ভালবাসে; কেবল প্রথমোক্ত স্থলে প্রেমের গতি অসঙ্গত দিকে গিয়াছে, কিন্তু অপর স্থলে উহা প্রকৃত দিকে প্রধাবিত। যে অগ্নি আমাদের ভোজন-পাকে সহায়তা করে, তাহাই আবার একটী শিশুদাহেরও কারণ হইতে পারে; ইহাতে অগ্নির কিছু দোষ নাই। ব্যবহারগুণে ফলের তারতম্য হয় মাত্র। অতএব এই প্রেম, সঙ্গের জন্য এই প্রবল স্পৃহা, দুই জনের এক হইবার জন্য আগ্রহ, আবার হয়ত, অবশেষে সমুদয় একে লয় করিবার ইচ্ছা, উত্তম বা অধমভাবে সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ভক্তিযোগ উচ্চতর প্রেমের বিজ্ঞান। উহা আমাদিগকে এই ভাবকে চালনা করিতে, উহাকে শাসনে রাখিতে, উহাকে নিজের আয়ত্তাধীনে রাখিতে, উহার সদ্ব্যবহার করিতে, উহাকে একটা নূতন পথে প্রধাবিত করিতে, ও উহা হইতে উচ্চতর ও মহান্ ফলরাশি লাভ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আনন্দে প্রেরণা করিবার উপায় প্রদর্শন করে। ভক্তিযোগ কিছু ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয় না—উহাতে কেবল বলে, "সেই পরম পুরুষে আসক্ত হও।" আর সেই পরম পুরুষ যাঁহার প্রেমের বিষয়, তাঁহার নিকট হইতে নিম্নভাবাপন্ন সবই আপনা আপনি চলিয়া যায়।

"আমি তোমার সম্বন্ধে আর কিছু জানি না, কেবল জানি,

তুমি আমার। তুমি সুন্দর, আহা তুমি অতি সুন্দর, তুমি স্বয়ং সৌন্দর্য্য-স্বরূপ।" এই যোগে আমাদের নিকট হইতে কেবল এই টুকু চাওয়া হয় যে, আমাদের সুন্দর বস্তুর জন্য যে তৃষ্ণা আছে, তাহা ভগবানের প্রতি প্রযুক্ত হউক। মনুষ্য-মুখে, আকাশে, তারায় অথবা চন্দ্রে কি সৌন্দর্য্য আছে? উহা কেবল প্রকৃত, সর্ব্বব্যাপী, ভগবৎ-সৌন্দর্য্যের আংশিক প্রকাশ মাত্র। "তিনি প্রকাশিত বলিয়া, সমুদয় প্রকাশিত।" * ভক্তির এই উচ্চ ভূমিতে দণ্ডায়মান হও। উহা একেবারে তোমাদের ক্ষুদ্র আমিত্ব-ভাব ভুলাইয়া দিবে। জগতের ক্ষুদ্র স্বার্থপর আকর্ষণ সমূহ হইতে আপনাকে সরাইয়া লও। কেবল মনুষ্য-জাতিকেই তোমার মানবীয় ও অন্যান্য কার্য্য-প্রবৃত্তির এক-মাত্র কেন্দ্র মনে করিও না। সাক্ষিরূপে, শিক্ষাকর্ত্তা রূপে দণ্ডায়মান হও ও প্রকৃতির সমুদয় ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ কর। মানুষের প্রতি আসক্তি-শূন্য হও। দেখ, জগতে এই প্রবল প্রেম-প্রবাহ কিরূপে কার্য্য করিতেছে। কখনও কখনও হয়ত একটু সঙ্ঘর্ষণ হইল। কিন্তু উহা কেবল সেই পরম প্রেম-লাভ জন্য চেষ্টার পথে ঘটিয়া থাকে মাত্র। কখনও একটু পতন হইল, কিন্তু এই সকল গুলিই কেবল পথের ব্যাপার মাত্র। এক-ধারে সরিয়া দাঁড়াও ও এই সঙ্ঘর্ষণ গুলিকে আসিতে দাও। যখন তুমি এই সংসার-প্রবাহের মধ্যে পতিত থাক, তখনই তুমি এই সঙ্ঘর্ষণ গুলি অনুভব কর। কিন্তু যখনই তুমি কেবল সাক্ষী ও শিক্ষাকর্ত্তা রূপে বাহিরে দণ্ডায়মান হও, তখনই তুমি

---

* তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

কঠোপনিষৎ। ৫ম বল্লী, ১৫ শ্লোক।

দেখিতে পাও, অনন্ত আধারে ভগবান্ প্রেমরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

"যেখানেই একটু আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, অতি কুৎসিৎ বিষয়ে হইলেও, সেখানে সেই অনন্ত আনন্দ-স্বরূপ স্বয়ং ভগবানের অংশ রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে।" অতি নীচতম আসক্তিতেও ভগবৎ-প্রেমের বীজ রহিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় ভগবানের একটী নাম 'হরি'। উহার অর্থ এই, তিনি সকলকেই নিজের ভিতর টানিয়া লইতেছেন। প্রকৃত পক্ষে—তিনিই মানব-হৃদয়ের প্রকৃত আকর্ষণের উপযুক্ত। প্রকৃত পক্ষে আত্মাকে কে আকর্ষণ করিতে পারে? কেবল তিনিই। তুমি কি মনে কর, মৃত জড় বস্তু কখন আত্মাকে আকর্ষণ করিতে পারে? উহা কখন করে নাই, করিবেও না। তুমি কি মনে কর, মানুষ যখন সুন্দর মুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন কেবল কতকগুলি পরমাণু সমষ্টিই তাহাকে আকর্ষণ করে? কখনই নহে। এই সমুদয় জড় পরমাণুর পশ্চাতে নিশ্চয়ই ঐশ্বরিক প্রভাব ও শক্তি রহিয়াছে। অজ্ঞান লোকে ইহা জানে না। কিন্তু তথাপি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, সে উহা দ্বারাই, কেবল উহা দ্বারাই আকৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং দেখা গেল, খুব নিম্নদরের আসক্তিও ঈশ্বরের নিকট উহার শক্তি লাভ করিতেছে। "হে প্রিয়তমে, পতির জন্য পতিকে কেহ ভালবাসে না, পতিস্থ অন্তরস্থ আত্মার জন্যই লোকে পতিকে ভাল বাসে।" * প্রেমিকা পত্নীগণ ইহা না জানিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও

* ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। বৃহদারণ্যক, ২ অঃ, ৪ব্রাঃ।

উক্ত তত্ত্বটী সত্য। "হে প্রিয়তমে, পত্নীর জন্য পত্নীকে কেহ ভালবাসে না, কিন্তু পত্নীর অন্তরস্থ আত্মার জন্যই পত্নী প্রিয় হয়।"* এইরূপ কেহই নিজ সন্তানকে অথবা আর কাহাকে তাঁহাদের অন্তরস্থ আত্মার জন্য ব্যতীত অন্য কোন কারণে ভালবাসে না। ভগবান্ যেন একটী বৃহৎ চুম্বক-প্রস্তর-স্বরূপ। আমরা যেন লৌহ-চূর্ণের ন্যায়। আমরা সকলেই সদা সর্ব্বদা তাঁহার দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছি। আমরা সকলেই তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। জগতে এই যে নানাবিধ চেষ্টা—এই সকলের একমাত্র লক্ষ্য কেবল স্বার্থ হইতে পারে না। মূর্খেরা জানে না, তাহারা কি করিতেছে। কিন্তু তাহাদের সমুদয় জীবনের কার্য্য কেবল সেই বৃহৎ চুম্বকের দিকে অগ্রসর হওয়া। আমাদের জীবনের এই মহা কঠোর নানাবিধ চেষ্টা সকলের উদ্দেশ্য কেবল পরিণামে তাঁহার নিকট যাওয়া ও তাঁহার সহিত একীভূত হওয়া।

ভক্তিযোগী জীবনের এই সকল মহা কঠোর চেষ্টা ও উদ্যম সকলের অর্থ বুঝেন। তিনি এই সকল টানাপড়েনের ভিতর দিয়া আসিয়াছেন; উহাদের অর্থ কি জানেন। সুতরাং তিনি অতিশয় আগ্রহের সহিত উহাদের সংঘর্ষণগুলি হইতে রক্ষা পাইতে চাহেন। তিনি ঐ সংঘর্ষণ ছাড়াইয়া সমুদয় আকর্ষণের কেন্দ্র-স্বরূপ হরির নিকট একেবারে যাইতে চাহেন। ভক্তের ত্যাগ, ইহাই—ভগবানের দিকে এই মহান্ আকর্ষণ তাঁহার আর সকল

---

* ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ। ২য় অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণম্।

আসক্তিকে নাশ করিয়া দেয়। তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট এই অনন্ত মহান্ প্রেম-সমুদ্র তাঁহার হৃদয়স্থ আর সকল আসক্তিকে অপসারিত করিয়া দেয়। তখন আর কি হইবে? ভক্ত স্বয়ং ভগবান্-রূপ প্রেম-সমুদ্রের জলে আপনার হৃদয়কে পরিপূর্ণ দেখেন। তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেমের স্থান নাই। তাৎপর্য্য এই—ভক্তের বৈরাগ্য অর্থাৎ ভগবান্ ভিন্ন সমুদয় বিষয়ে অনাসক্তি তাঁহার ভগবানের প্রতি পরম অনুরাগ হইতে প্রসূত হয়।

পরাভক্তি লাভের জন্য এইরূপ ভাবে প্রস্তুত হওয়াই আবশ্যক। এই বৈরাগ্যলাভ হইলে আত্মার পক্ষে পরাভক্তির উচ্চতম শিখরে উঠিবার দ্বার যেন খুলিয়া যায়। তখনই আমরা বুঝিতে আরম্ভ করি, পরাভক্তি কি। আর যিনি পরাভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন একমাত্র তাঁহারই বলিবার অধিকার আছে যে, প্রতিমাপূজা বা বাহ্য অনুষ্ঠানাদি তাঁহার অধ্যাত্মতত্ত্বানুভূতির সহায়ক নহে—একেবারেই অনাবশ্যক। তিনিই কেবল মানুষের ভ্রাতৃভাবরূপ মহান্ সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন। অপরে কেবল বাক্যব্যয় করে মাত্র। তিনি তখন আর কোন ভেদ দেখিতে পান না। মহান্ প্রেম-সমুদ্র তাঁহার অন্তরে তখন প্রবেশ করিয়াছে; তখন তিনি মানুষের ভিতর আর মানুষ দেখেন না, তিনি সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রিয়তমকে দেখিতে পান। প্রতি মুখ দিয়া তাঁহার সেই হরি প্রকাশ পান। সূর্য্য বা চন্দ্রের আলোক তাঁহারই প্রকাশ মাত্র। যেখানেই কোন সৌন্দর্য্য বা মহত্ত্ব দেখা যায়, তাঁহার পক্ষে সবই সেই ভগবানের। এরূপ ভক্ত এখনও জগতে আছেন। জগৎ কখনই এতদ্রূপ-ভক্ত-বিরহিত হন না। এইরূপ ব্যক্তিই সর্পদষ্ট হইলে বলে, আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে দূত আসিয়াছিল। এইরূপ ব্যক্তিরই

কেবল সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে কথা কহিবার অধিকার আছে। তাঁহারা কখন কোনরূপ ক্রোধ অনুভব করেন না। তাঁহাদের মনে ঘৃণা অথবা ঈর্ষ্যারূপ কোন প্রতিক্রিয়া উদয় হয় না। বাহ্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমুদয় তাঁহার নিকট হইতে অন্তর্হিত। তাঁহাদের ক্রোধোদয়ের কি সম্ভাবনা, যখন প্রেমবলে অতীন্দ্রিয় সত্যকে তাঁহারা সর্ব্বদা দেখিতে সক্ষম?

ভক্তিযোগের স্বাভাবিকতা ও উহার রহস্য।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যাহারা সর্ব্বদা অবহিত হইয়া তোমার উপাসনা করে, আর যাহারা অব্যক্ত নির্গুণের উপাসক, ইহার মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী?* ...

---

* অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দেন, যাহারা আমাতে মন একাগ্র করিয়া নিষ্ঠার সহিত ও পরম বিশ্বাস সহকারে আমার উপাসনা করে, তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ উপাসক, তাহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী। যাঁহারা নির্গুণ, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, নিত্যস্বরূপকে ইন্দ্রিয়সংযম ও সমুদয় বিষয়ে সমত্ব অবলম্বন করিয়া—উপাসনা করেন, তাঁহারাও সকল ভূতের হিতে সর্ব্বদা রত থাকাতে আমাতেই গমন করেন। কিন্তু যাঁহাদের মন সেই অব্যক্তে আসক্ত, তাঁহাদের পক্ষে এই পথে চলাই কষ্ট। কারণ, দেহী ব্যক্তি অতি কষ্টে এই অব্যক্ত গতি লাভ করিতে পারে। যাহারা নিজ সমুদয় কার্য্য আমাতে সমর্পণ করিয়া, আমার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া সব বিষয়ে আসক্তি-শূন্য হইয়া আমারই ধ্যান ও আরাধনা করে, আমি তাহাদিগকে শীঘ্রই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার করি; কারণ, তাহাদের মন সর্ব্বদাই আমার প্রতি সম্পূর্ণ রূপে আসক্ত। এখানে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ উভয়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বাক্যে উভয়েরই লক্ষণ করা হইয়াছে। জ্ঞানযোগ অবশ্য খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবপূর্ণ বটে, আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক মানুষেই ভাবে, দর্শনের

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

ভগবদ্গীতা, ১২শ অধ্যায়, ৫ম হইতে ৭ম শ্লোক।

অাদেশমত সে অনায়াসে জীবন যাপন করিতে সক্ষম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দার্শনিকের জীবন যাপন করা অতি কঠিন। জ্ঞানমার্গের দ্বারা জীবন নিয়মিত করিতে গিয়া অনেক সময় আমাদের অনেক বিপদে পড়িবার উপক্রম হয়।

জগতে দুই প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একদল আসুরী-প্রকৃতি। ইহারা শরীরের যত্নকেই জীবনের সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করে। আর যাহারা দেবপ্রকৃতি, তাহারা এই শরীরকে কেবল একটী বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের উপায়স্বরূপ ভাবে; উহা যেন আত্মার উন্নতি সাধনের একটী যন্ত্রমাত্র। শয়তান নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শাস্ত্র উদ্ধৃত করিতে পারে, করিয়াও থাকে। সুতরাং জ্ঞানমার্গ যেমন সাধুব্যক্তির কার্য্যের প্রবল প্রণোদক স্বরূপ, তদ্রূপ অসাধুব্যক্তিরও কার্য্যের যেন সমর্থক বলিয়া প্রতীত হয়। জ্ঞানযোগে ইহাই মহা বিপদাশঙ্কা। কিন্তু ভক্তিযোগ স্বাভাবিক, মধুর ও কোমল। ভক্ত জ্ঞানযোগীর মত খুব উঁচুতেও উঠেন না, সুতরাং তাঁহার এইরূপ গভীর পতনের আশঙ্কাও নাই। যতদিন না আত্মার সমুদয় বন্ধন চলিয়া যাইতেছে, ততদিন অবশ্য আত্মা মুক্ত হইতে পারে না—সাধক ব্যক্তি যে পথই অবলম্বন করুন না কেন।

নিম্নলিখিত শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাভাগা গোপীগণের পক্ষে কিরূপে আত্মার বন্ধনকারী পুণ্য ও পাপ শৃঙ্খলদ্বয়ই ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল। ভগবদ্ধ্যানজনিত তীব্র সুখ তাঁহাদের পুণ্যকর্ম্মের বন্ধন অপসারিত করিল, আর তাঁহার অপ্রাপ্তিজনিত তীব্র দুঃখে তাঁহাদের সমুদয় পাপ ধৌত হইয়া গেল—তখন তাঁহারা মুক্তিলাভ করিলেন।* সুতরাং ভক্তিযোগের গুহ্য রহস্য এই যে,

* তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদক্ষীণপুণ্যা চ যা তথা।

মনুষ্যহৃদয়ের বিভিন্ন বাসনা ও সমুদয় ভাবগুলি স্বরূপতঃ অসৎ নহে; তাহাদিগকে ধীরে ধীরে আমাদের বশবর্ত্তী করিয়া ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চাভিমুখী করিতে হইবে, যতদিন না উহারা চরমোৎকর্ষ লাভ করে। উহাদের সর্ব্বোচ্চ গতি ভগবান, উহাদের অন্যান্য সকল গতিই নিম্নাভিমুখী। আমাদের জীবনে সুখ ও দুঃখ পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। যখন কোন লোক ধন অথবা ঐরূপ কোন সাংসারিক বস্তুর অপ্রাপ্তি হেতু দুঃখ অনুভব করে, তখন বুঝিতে হইবে, সে তাহার প্রবৃত্তিকে অসৎদিকে প্রেরণ করিতেছে। তথাপি দুঃখের প্রয়োজনীয়তা আছে। লোকে যদি 'কেন আমি সেই পরম পুরুষকে লাভ করিতে পারিলাম না, কেন আমি ভগবানকে পাইলাম না' বলিয়া যন্ত্রণায় অস্থির হয়, সেই যন্ত্রণাই তাহার মুক্তির কারণ হইবে। কয়েকটী মুদ্রা পাইলে যখন তোমার আহ্লাদ হয়, তখন বুঝিতে হইবে, তুমি তোমার আহ্লাদ-বৃত্তিকে অসৎদিকে প্রেরণ করিতেছ। উহাকে উচ্চতর দিকে প্রেরণ করিতে হইবে, যেন উহা সেই চরম লক্ষ্যের অনুগামী হইতে পারে। আশা এইরূপ উচ্চ আদর্শে আনন্দ লাভ করাই আমাদের সর্ব্বোচ্চ আনন্দের বিষয় হওয়া উচিত। অন্যান্য ভাব সম্বন্ধেও এই একই কথা। ভক্ত বলেন, এই সকল ভাব বা প্রবৃত্তির মধ্যে কোনটীই মন্দ নহে। সুতরাং তিনি ঐ গুলিকে লইয়া ভগবানের দিকে প্রেরণ করেন, তাহাতে কৃতকার্য্যও হন।

তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনাশেষপাতকাঃ।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকাঃ।
বিষ্ণুপুরাণ। ৫ম অংশ-১৩শ অধ্যায়, ২১২২ শ্লোক॥

প্রেমের বিভিন্ন রূপ।

প্রেম নিম্নলিখিত নানাবিধ ভাব সমূহ রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রথম—শ্রদ্ধা। লোকে মন্দির ও তীর্থস্থানসমূহের প্রতি এত ভক্তি করে কেন? কারণ, তিনি যে সকল স্থানে পূজিত হন, সেই সকল স্থানের সহিত তাঁহার সত্তা জড়িত। সকল দেশেই লোকে ধর্ম্মশিক্ষকগণের প্রতি এত ভক্তিসম্পন্ন কেন? মনুষ্য-হৃদয়ের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক, কারণ, সকল আচার্য্যই ভগবানকেই ঘোষণা করিয়া থাকেন। একটু তলাইয়া দেখিলে বোধ হইবে, এই শ্রদ্ধা প্রেমপ্রসূত। আমরা যাহাকে ভালবাসি না, তাহার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারি না। তার পর প্রীতি—ভগবচ্চিন্তায় আনন্দানুভব। মানুষ ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে কি বিজাতীয় আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে! মানুষ ইন্দ্রিয়সুখকর দ্রব্য লাভ করিতে সর্ব্বত্রেই যাইয়া থাকে, মহা বিপদেরও সম্মুখীন হয়। ভক্তের চাই এই তীব্র ভালবাসা। উহাকে অবশ্য ভগবানের দিকে প্রেরণ করিতে হইবে। তৎপরে বিরহ সর্ব্ব প্রকার দুঃখের মধ্যে অতি মিষ্ট দুঃখ—প্রেমিকের অভাবজনিত মহাদুঃখ। যখন মানুষ ভগবানকে লাভ করিতে পারি নাই, যে জিনিস জানিবার, তাহা জানিলাম না বলিয়া অতিশয় ব্যাকুল হয়, ও ইহার জন্য যন্ত্রণায় অস্থির ও উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখনই বিরহ আসিয়াছে, বুঝিতে হইবে। মনের এইরূপ অবস্থা হইলে প্রেমাস্পদ ব্যতীত অন্য কাহারও সম্মুখে থাকিতে বিরক্তি বোধ হয় (একরতিবিচিকিৎসা)। পার্থিব প্রেমে আমরা দেখিতে পাই, এই বিরহ কত সময় আসিয়া থাকে। মানুষে যখন স্ত্রীলোকের প্রতি যথার্থ তীব্রভাবে আসক্ত হয়, অথবা স্ত্রীলোক পুরু-

যের প্রতি এইরূপ ভাবে আসক্ত হয়, তখন তাহারা যাহাদিগকে ভাল না বাসে, তাহাদের নিকট থাকিতে স্বভাবতই একটু বিরক্তি অনুভব করে। এইরূপে যখন পরাভক্তি হৃদয়ে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, তখন ঐ ভক্তির বিরোধী বিষয় সম্বন্ধে মনে এইরূপ বিরক্তি আসিতে থাকে। তখন ভগবান্ ব্যতীত অন্য বিষয়ে কথা কহাও ভক্তের পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। "তাঁহার বিষয়, কেবল তাঁহার বিষয়ে চিন্তা কর, অন্য সকল কথা ত্যাগ কর।" * যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহেন, ভক্ত তাঁহাদিগকে বন্ধু বলিয়া মনে করেন, কিন্তু যাঁহারা অন্য বিষয়ে কথা কহেন, তাঁহারা তাঁহার পক্ষে শত্রুরূপে প্রতীয়মান হন। যখন জীবন কেবল এই একমাত্র প্রেমরূপ উচ্চ উদ্দেশ্যের জন্যই রক্ষিত হয়, তখন প্রেমের আরও একটী উচ্চতর সোপানে পঁহুছান গেল, বুঝিতে হইবে। তখন জীবন কেবল সেই প্রেমের জন্যই ধারণের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। উহা ব্যতীত এক মুহূর্ত্তের জন্যও জীবন ধারণ করা অসম্ভব বোধ হয়। জীবন কেবল সেই প্রিয়তমের জন্যই মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। তদীয়তা—ভক্তি-মতে সাধক যখন সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন এই তদীয়তা আইসে। যখন সে কৃতার্থতা লাভ করে, যখন সে ঈশ্বর লাভ করে, যখন সে যেন ভগবৎপাদপদ্ম স্পর্শ করে, তখন তাহার প্রকৃতি বিশুদ্ধ হইয়া যায়—সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; তখন তাহার জীবনের সমুদয়

---

* তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা
বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ।
মুণ্ডক উপনিষদ, ২য় মুণ্ডক, ২য় খণ্ড, ৫ম শ্লোক।

সাধ পূর্ণ হইয়া যায়। তথাপি এইরূপ অনেক ভক্ত কেবল তাঁহার উপাসনার জন্যই জীবন ধারণ করেন। এই জীবনে ইহাই একমাত্র সুখ—তাঁহারা তাহা ছাড়িতে চাহেন না। "হে রাজন্, হরির এতাদৃশ মনোহর গুণরাশি যে, যাঁহারা একেবারে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহারাও ভগবানকে কেবল প্রেমের জন্যই প্রেম করিয়া থাকেন—" * (যাঁহাকে সকল দেবগণ, মুমুক্ষু ও ব্রহ্মবাদীরাও উপাসনা করিয়া থাকেন।)† প্রেমের স্বভাবই এই। যখন মানুষ আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যায়, আর কিছু যে নিজের হইতে পারে, তাহাও যখন তাহার মনে থাকে না, তখনই তদীয়তা লাভ হয়। তখন তাহার সকলই পবিত্র বলিয়া বোধ হয়, কারণ উহা তাঁহার প্রেমাস্পদের। সাংসারিক প্রেমেও প্রেমাস্পদের সকল জিনিষই প্রেমিকের পক্ষে পবিত্র ও প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। নিজের হৃদয়-ধনের এক টুকরা বস্ত্রখণ্ডও সে ভাল বাসে। এইরূপে যে ভগবানকে ভাল বাসে, সে সমুদয় জগৎকেও ভালবাসে; কারণ সমুদয় জগৎ তাঁহার।

---

* আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত—১ম স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায়, ১০ শ্লোক।

† যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি।
নৃসিংহ তাপনী উপনিষদ্। ৫ম খণ্ড, ২য় ভাগ, ১৬ শ্লোক।

সার্ব্বজনীন প্রেম।

আমরা অগ্রে সমষ্টিকে ভাল না বাসিয়া ব্যষ্টিকে কি করিয়া ভাল বাসিব? ভগবানই সমষ্টি—সমুদয় জগতের যেন একটা সাধারণ ভাব, আর এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্যষ্টি। সমষ্টিকে ভাল বাসিলেই সমুদয় জগৎকে ভাল বাসিতে পারা যায়। এই সমষ্টিই যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ লক্ষ খণ্ডের সংযোগ-লব্ধ একত্ব-স্বরূপ। ভারতীয় দার্শনিকগণ ব্যষ্টি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না। তাঁহারা ব্যষ্টির দিকে চকিতের ন্যায় দৃষ্টিপাত করিয়া যে সামান্য ভাবগুলির মধ্যে সমুদয় বিশেষ রহিয়াছে, তাহার অন্বেষণে অমনি অগ্রসর হন। ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্ম সেই একমাত্র অনন্তের অনুসন্ধানেই ব্যস্ত। জ্ঞানী সেই অনন্ত পূর্ণ বস্তু লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি সেই পূর্ণ ও সকল বিশেষের আভ্যন্তরীণ সাধারণ তত্ত্বস্বরূপ পুরুষকে লাভ করিতে চাহেন, যাঁহাকে জানিলে সমুদয় জানা হয়। ভক্ত সেই এক সত্তাসামান্যরূপ অণোরণীয়ান্ পুরুষকে সাক্ষাৎ করিতে চান, যাঁহাকে ভাল বাসিলে সমুদয় জগৎকে ভালবাসা হয়। যোগী সেই এক সামান্যীভূত শক্তি লাভ করিতে চান, যাহাকে বশীভূত করিয়া তিনি সমুদয় জগৎকে বশীভূত করিতে পারেন। ভারতবাসীর মন সর্ব্ববিষয়েই এই একমাত্র বিশেষ বিষয়ের দিকেই ধাবিত হইয়াছে; কি জড়-বিজ্ঞানে, কি মনোবিজ্ঞানে, কি ভক্তিতত্ত্বে, কি দর্শনে, সর্ব্বত্রেই সেই এক সাধারণের অন্বেষণ করিয়াছে। ইহা হইতেই এই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে, যদি তুমি একটা একটা ব্যক্তিকে ভাল বাসিতে থাক, এইরূপ অনন্ত কালের জন্য বাসিতে পার, কিন্তু তথাপি সমুদয় জগৎকে ভাল বাসিতে কখনই সক্ষম হইবে না। কিন্তু যখন ইহার

আভ্যন্তরীণ রহস্য অবগত হওয়া যায়, অর্থাৎ যখন লোক বুঝিতে পারা যায় যে, জগতে যত মুক্ত, মুমুক্ষু বা বদ্ধ জীব আছে সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য সেই ভগবান্, তখনই তাহার পক্ষে সার্ব্বজনীন প্রেম সম্ভব হইতে পারে। ভগবান সমষ্টি এবং এই ব্যক্ত জগৎ ভগবানের খণ্ডভাব—ভগবানের অভিব্যক্তিমাত্র। আমরা এই সমষ্টিকে ভাল-বাসিলেই সমুদয় জগৎকে ভালবাসা হইল। তখন জগতের প্রতি ভালবাসা ও জগতের হিত করা প্রভৃতি সবই আপনা আপনি আসিবে। প্রথমে ভগবৎ-প্রেমের দ্বারা আমাদিগকে এই শক্তি লাভ করিতে হইবে। নতুবা জগতের হিত করা কৌতুকের কথা নহে। ভক্ত বলেন, "সমুদয়ই তাঁর, তিনি আমার প্রিয়তম। আমি তাঁহাকে ভালবাসি।" এইরূপে সমুদয়ই ভক্তের নিকট পবিত্র বলিয়া বোধ হয়, কারণ সবই তাঁর। সকলেই তাঁহার শরীর, তাঁহার প্রকাশ মাত্র। তবে আমরা কিরূপে অপরকে হিংসা করিব? কিরূপে অপরকে ভাল না বাসিয়া থাকিব? ভগবৎ-প্রেম আসিলেই তাহার নিশ্চিত ফল-স্বরূপ সর্ব্বভূতে প্রেম আসিবে। আমরা যতই ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইব, আমরা ততই সমুদয় বস্তুকে তাঁহার অন্তর্গত বলিয়া দেখিতে শিখিব। যখন আত্মা এই পরম প্রেমানন্দ আপনার ভিতরে উপলব্ধি করিতে পারেন, তখন তাঁহাকে সমুদয় বস্তুতে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। তখন আমাদের হৃদয় প্রেমের এক অনন্ত প্রস্রবণ হইয়া দাঁড়ায়। যখন আমরা এই প্রেমের আরও উচ্চতর সোপানে উপনীত হই, তখন জাগতিক সমুদয় বস্তুর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য গুলি সবই অন্তর্হিত হইয়া যায়। মানুষকে আর মানুষ বলিয়া বোধ হইবে না, ভগবান বলিয়া বোধ হইবে। এমন কি, ব্যাঘ্রকে

আর ব্যাঘ্র বলিয়া অনুভব হইবে না, ভগবানের রূপ বলিয়া বোধ হইবে। এইরূপে এই প্রবল ভক্তির অবস্থায় সমুদয় জীব, সমুদয় প্রাণী, সকলকেই উপাসনা করা হয়। হরিকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির সর্ব্বভূতের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রয়োগ করা উচিত। * এইরূপ প্রবল সর্ব্বগ্রাসী প্রেমের ফলে পূর্ণ আত্মনিবেদনের ভাব আইসে। তথন এই ভাব আইসে যে, যাহা কিছু ঘটে, কিছুই আমাদের প্রতিকূলে নহে—অপ্রাতিকূল্য। তথনই সেই প্রেমিক পুরুষ দুঃখ আসিলে বলিতে পারেন, আইস দুঃখ। কষ্ট আসিলে বলিতে পারেন, আইস কষ্ট, তুমিও আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে আসিতেছ। সর্প আসিলে সর্পকেও তিনি স্বাগত বলিতে পারেন। মৃত্যু আসিলে এরূপ ভক্ত মৃত্যুকে হাস্যের সহিত অভিনন্দন করিতে পারেন। "ধন্য আমি, আমার নিকট ইহারা আসিতেছে—আসুক সকলে।" ভগবান ও তৎসম্বন্ধীয় সমুদয় বস্তুর প্রতি প্রগাঢ় প্রেম হইতে প্রসূত এই পূর্ণ নির্ভরের অবস্থায়, ভক্ত সুখ ও দুঃখে বড় প্রভেদ করিতে পারেন না, অন্ততঃ যতটুকু তাঁহাকে স্পর্শ করে। মহাগৌরবকর বীরত্বের কার্য্যসমূহ হইতে এরূপ ভাবে প্রেমের সহিত কোনরূপ অভিযুক্তি না করিয়া ভগবানের ইচ্ছায় নির্ভর অবশ্যই বিশেষ প্রার্থনীয়। জগতের অধিকাংশ লোক শরীর-সর্ব্বস্ব। এই শরীর ও শরীর-সম্বন্ধীয় সকল বস্তুর সেবারূপ মহা অসুর আমাদের সকলের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। আমরা খুব লম্বাচৌড়া কথা কহিতে পারি, খুব উঁচু উঁচু বিষয় বলিতে পারি, কিন্তু তথাপি আমরা

---

* এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী।
কর্ত্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূতময়ং হরিং॥

শকুনির মত। আমাদের মন ভাগাড়ের সেই মড়াটার উপর আকৃষ্ট। জিজ্ঞাসা করি, আমাদের শরীর ব্যাঘ্র হইতে রক্ষিত হইবার প্রয়োজন কি? আমরা ব্যাঘ্রকে উহা দিতে পারি না কেন? উহাতে ত ব্যাঘ্রের তৃপ্তি হইবে, আর উহা সেই উচ্চ আত্মত্যাগ ও উপাসনা হইতে বড় অধিক নীচু নয়। যাহাতে অহংভাব একেবারে নাশ হইয়া যায়, তুমি কি সেই ভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পার? ভক্তিধর্ম্মের ইহা অতি উচ্চ চূড়া—ইহার উপরে উঠিলে যেন মাথা ঘুরিতে থাকে। আর খুব অল্প লোকই উহাতে উঠিয়াছে। কিন্তু যত দিন না মানুষ সর্ব্বদা এইরূপ আত্মত্যাগের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে প্রস্তুত হয়, ততদিন সে পূর্ণভক্ত হইতে পারে না। আমরা সকলেই ভালমন্দ যে কোনরূপেই হউক, অল্লাধিক সময়ের জন্য শরীরকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারি, কিন্তু তাহাতে হইল কি? শরীর ত একদিন যাইবে। শরীরের ত আর নিত্যতা নাই। ধন্য তাহারা, যাহাদের শরীর অপরের সেবায় নাশ হয়। ধন, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত, সাধু কেবল অপরের সেবাতেই উৎসর্গ করিয়া থাকেন। এই জগতে, যেখানে একমাত্র সত্য মৃত্যু, সেখানে যদি জীবন কোন অসৎকার্য্যে না গিয়া সৎকার্য্যে নষ্ট হয়, তাহা খুব ভাল বলিতে হইবে। আমরা কোনরূপে ৫০, জোর ১০০ বৎসর বাঁচিতে পারি, কিন্তু তার পর? তার পর কি হয়? যে কোন বস্তু মিশ্রণে উৎপন্ন, তাই বিশ্লিষ্ট হইয়া নাশ হইয়া যায়। এক সময়ে না এক সময়ে উহা বিশ্লিষ্ট হইবেই হইবে। যিশু মরিয়াছিলেন, বুদ্ধ মরিয়াছিলেন, মহম্মদ মরিয়াছিলেন। জগতের সকল বড় বড় মহাপুরুষ এবং আচার্য্যেরাও মরিয়াছিলেন। ভক্ত বলেন, 'এই অস্থায়ী জগতে, যেখানে সবই ক্রমশঃ ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে, এখানে আমরা যতটুকু সময় পাই,

তাহারই সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক।' আর জীবনের সর্ব্বোচ্চ কার্য্য—জীবনকে সর্ব্বভূতের সেবায় বিনিয়োগ। এই ভয়ানক দেহাত্ম-বুদ্ধিই জগতে সর্ব্ব প্রকার স্বার্থপরতার কারণ। আমাদের মহাভ্রম এই যে, আমরা এই শরীরটী, আর এই বিশ্বাসে উহাকে রক্ষা ও সন্তুষ্ট করিবার প্রাণপণ চেষ্টা। যদি তুমি জানিতে পার, তুমি শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তবে এমন কিছুই নাই, যাহার সহিত তোমার বিরোধ উপস্থিত হইবে। তখন তুমি সর্ব্ব প্রকার স্বার্থপরতার অতীত হইয়া গেলে। অতএব, ভক্ত বলেন, আমাদিগকে জগতের সকল পদার্থ সম্বন্ধে মৃতের ন্যায় থাকিতে হইবে। উহাই আত্মসমর্পণ—শরণাগতি। 'যাহা হইবার হউক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক,' ইহার অর্থই ইহাই—গণ্ডগোল, মারামারি করিয়া যাওয়া ও সেই সঙ্গে মনে করা, ভগবান আমাদের সমুদয় দুর্ব্বলতা ও সাংসারিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রয়োজক, তাহা নহে। হইতে পারে, আমাদের স্বার্থপূর্ণ বিবাদাদি হইতেও ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে—উহা কিন্তু ভগবানের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য মাত্র। পূর্ণ ভক্তের ভাব—নিজের জন্য কোন ইচ্ছা বা কার্য্য করা হইতে পারে না। "প্রভু, লোকে তোমার নামে বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণ করে, তোমার নামে কত দান করে; আমি গরীব, আমি অতি অকিঞ্চিৎকর। তাই এই শরীর লইয়া তোমার পাদপদ্মে দিলাম। প্রভু আমায় ত্যাগ করিও না।" ইহাই ভক্ত-হৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে উত্থিত প্রার্থনা। যিনি একবার ইহা আস্বাদ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এই প্রিয়তম প্রভুর নিকট অনন্তকালের জন্য আত্মসমর্পণ, সমুদয় ধন প্রভুত্ব, এমন কি, খ্যাতি ও ভোগের খুব উচ্চাশা হইতেও শ্রেষ্ঠ। শান্তভাবে ভগবানের প্রতি এই নির্ভর-জনিত শান্তি আমাদের বুদ্ধিরও অতীত

ও অমূল্য। অপ্রাতিকূল্য অর্থে মনের এমন একটী অবস্থা, যখন উহার কোন আসক্তি থাকে না। সুতরাং এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি কোন ঘটনাকেই তাঁহার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করেন না। এইরূপ উচ্চ নির্ভরশীলতার অবস্থায় সর্ব্ব প্রকারের আসক্তি সম্পূর্ণ রূপে চলিয়া যায়। কেবল সেই সর্ব্ব জগতের প্রাণ ও আধার-স্বরূপ ভগবানের প্রতি সেই সর্ব্বগ্রাসী প্রেম রহিয়া যায়। ভগবানের প্রতি এই প্রেমের আকর্ষণ আত্মার বন্ধনের কারণ নহে, বরং উহা আত্মার সর্ব্ববন্ধন মোচনে সাহায্য করে।

পরাবিদ্যা ও পরাভক্তি এক।

উপনিষদ্ পরা ও অপরা বিদ্যা নামক দুইটী বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। আর ভক্তের নিকট এই পরাবিদ্যা ও পরাভক্তিতে বাস্তবিক কিছু প্রভেদ নাই। ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলেন, জানিবার উপযুক্ত দুই প্রকার বিদ্যা আছে—পরা ও অপরা। উহার মধ্যে অপরা বিদ্যা—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ব বেদ, শিক্ষা (উচ্চারণ, যতি ইত্যাদির বিদ্যা) কল্প (যজ্ঞ-পদ্ধতি) ব্যাকরণ, নিরুক্ত, (বৈদিক শব্দ সমূহের ব্যুৎপত্তি ও তাহাদের অর্থ যে শাস্ত্রের দ্বারা জানা যায়), ছন্দ ও জ্যোতিষ। আর পরা বিদ্যা তাহাই যদ্দ্বারা সেই অক্ষরকে জানিতে পারা যায়।" * সুতরাং স্পষ্টই প্রদর্শিত হইল যে,

---

* দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাহপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহ

এই পরা বিদ্যা ও ব্রহ্মজ্ঞান এক পদার্থ। দেবী ভাগবতে আমা-দিগকে পরা ভক্তির এই নিম্নলিখিত লক্ষণ দিয়াছেন। "যেমন তৈল এক পাত্র হইতে পাত্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হইবার সময় অবিচ্ছিন্ন ধারায় পতিত হয়, তদ্রূপ মন যখন অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভগবানকে স্মরণ করিতে থাকে, তখনই পরাভক্তির উদয় হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।" অচ্ছেদ্য আসক্তির সহিত ভগবানের দিকে হৃদয় ও মনের এইরূপ অবিচ্ছিন্ন ও নিত্য স্থির ভাবই সর্ব্বোচ্চ ভগবৎ-প্রেম। আর সকল প্রকার ভক্তিই কেবল এই পরাভক্তির—রাগা-নুগা ভক্তির—সোপানমাত্র। যখন মানুষের হৃদয়ে এই পরানু-রাগের উদয় হয়, তখন তাহার মন সর্ব্বদাই ভগবানের চিন্তা করিবে, আর কিছুই তাহার স্মৃতিপথে উদয় হইবে না। সে নিজ মনে তখন ভগবান ব্যতীত অন্য কোন চিন্তাকে স্থান দিবে না। তখন তাহার আত্মা অভেদ্য পবিত্রতাবরণে আবৃত থাকিবে, এবং মানসিক ও ভৌতিক সর্ব্ব প্রকার বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া শান্তমুক্ত ভাব ধারণ করিবে। এরূপ লোকেই কেবল ভগবা-নকে নিজ অন্তরে উপাসনা করিতে সক্ষম। তাঁহার নিকট অনুষ্ঠান পদ্ধতি, প্রতিমাদি, শাস্ত্রাদি, মতামত সমুদয়ই অনাবশ্যক হইয়া পড়ে—উহাদের দ্বারা তাঁহার আর কোন উপকার হয় না। ভগবানকে এরূপ ভাবে ভালবাসা বড় সহজ কর্ম্ম নহে। সাধারণ মানবীয় প্রেম সেখানেই বৃদ্ধি পায়, যেখানে উহার প্রতিদান পায়। যেখানে প্রতিদান না পায়, সেখানে উদাসীন ভাব

...র্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

মুণ্ডকোপনিষৎ। ১ম মুণ্ডক, ১ম খণ্ড, ৪,৫ শ্লোক।

আসিয়া প্রেমের স্থল অধিকার করে। বিশেষ বিশেষ স্থলে কিন্তু কোনরূপ প্রতিদান না পাইলেও প্রেমের বিকাশ দেখা যায়। আমরা ইহাকে পতঙ্গের অগ্নির প্রতি ভালবাসার সহিত তুলনা করিতে পারি। পতঙ্গ আগুনকে ভালবাসে, আর উহাতে পড়িয়া মরিয়া যায়। পতঙ্গের স্বভাবই এরূপ ভাবে ভালবাসা। জগতে যত প্রকার প্রেম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কেবল প্রেমের জন্যই যে প্রেম, তাহাই সর্ব্বোচ্চ ও পূর্ণ নিঃস্বার্থ প্রেম। এইরূপ প্রেম আধ্যাত্মিকতার ভূমিতে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেই পরা-ভক্তিতে লইয়া যায়।

প্রেম-ত্রিকোণ।

প্রেমকে আমরা একটী ত্রিকোণ-স্বরূপে প্রকাশ করিতে পারি। উহার প্রত্যেক কোণটীই যেন উহার একএকটী অবিভাজ্য স্বরূপের প্রকাশক। তিন কোণ ব্যতীত কোন ত্রিকোণ হইতে পারে না। আর প্রকৃত প্রেমও উহার নিম্নলিখিত তিনটী লক্ষণ ব্যতীত কোন রূপেই থাকিতে পারে না। প্রেম-স্বরূপ এই ত্রিকোণের একটী কোণ এই যে, প্রেমে কোনরূপ কেনা বেচা নাই। যেখানে কোন প্রতিদানের আশা থাকে, সেখানে প্রকৃত প্রেম জন্মিতে পারে না। উহা কেবল দোকানদারীতে পরিণত হয় মাত্র। যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁহার আজ্ঞাপালনের জন্য তাঁহার নিকট কোনরূপ বর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে,

ততদিন আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম জন্মিতে পারে না। যাহারা ভগবানের নিকট কিছু প্রাপ্তির আশায় উপাসনা করে, তাহারা ঐ বর প্রাপ্তির আশা না থাকিলে তাঁহাকে উপাসনা করিবে না। ভক্ত ভগবানকে ভাল বাসেন, তিনি প্রেমাস্পদ বলিয়া। প্রকৃত ভক্তের এই স্বর্গীয় ভাবোচ্ছ্বাসের আর কোন হেতু নাই। কথিত আছে, কোন সময়ে এক বনে এক রাজার সহিত এক সাধুর সাক্ষাৎ হয়। তিনি সাধুর সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়াই তাঁহার পবিত্রতা ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তখন রাজা তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, আমাকে কৃতার্থ করিবার জন্য আমার নিকট কিছু গ্রহণ করিতে হইবে। সাধু উহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন, বনের ফল আমার পর্য্যাপ্ত আহার, পর্ব্বত-নিঃসৃত পবিত্র সরিৎ আমার পর্য্যাপ্ত পানীয়, বৃক্ষত্বক্ আমার পর্য্যাপ্ত পরিধেয়, এবং গিরিগুহা আমার পর্য্যাপ্ত বাসস্থান। আমার তোমার নিকট অথবা অপর কাহারও নিকট কিছু লইবার প্রয়োজন কি? রাজা বলিলেন, প্রভু, আমার উপকারার্থ, কেবল আমার উপকারার্থ আমার হস্ত হইতে কিছু গ্রহণ করুন, আর আমার সহিত নগরে ও আমার রাজপ্রাসাদে চলুন। অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি অবশেষে যাইতে স্বীকার পাইলেন ও রাজার সহিত তাঁহার প্রাসাদে গেলেন। দান করিবার পূর্ব্বে রাজা বর মাগিতে লাগিলেন—প্রভু, আমার আরও সন্তান সন্ততি হউক, আমার আরও ধন হউক, আমার রাজ্য বৃদ্ধি হউক, আমার শরীর নীরোগ হউক ইত্যাদি। রাজা তাঁহার প্রার্থনা শেষ করিবার পূর্ব্বেই সাধু উঠিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া রাজা হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিতে লাগি-

লেন—চীৎকার করিতে লাগিলেন, প্রভু, চলিয়া গেলে? আমার দান গ্রহণ করিলে না? সাধু তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, ভিক্ষুক, আমি ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষা করি না। তুমি নিজে একজন ভিক্ষুক, তুমি আমাকে কি করিয়া ভিক্ষা দিবে? আমি এত বোকা নই যে, তোমার স্থায় ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা লইব। যাও, আমার অনুসরণ করিও না।" এখানে ভিক্ষুক আর ভগবানের প্রকৃত প্রেমিকদের ভিতর বেশ প্রভেদ করা হইয়াছে। এমন কি, মুক্তি অথবা অন্য কোন লাভের জন্য ভগবানের উপাসনাও নিম্নশ্রেণীর উপাসনা। প্রেম কোন লাভ চাহে না। প্রেম কেবল প্রেমের জন্যই কৃত হইয়া থাকে। ভক্ত ভগবানকে ভাল বাসেন, কারণ, তিনি না বাসিয়া থাকিতে পারেন না। তুমি একটী সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া উহাকে ভালবাসিতে লাগিলে। তুমি ঐ দৃশ্যের নিকট হইতে অনুগ্রহ-স্বরূপ কিছুই প্রার্থনা কর না। আর সেই দৃশ্যও তোমার নিকট কিছুই প্রার্থনা করে না। তথাপি উহার দর্শনে তোমার মনে আনন্দের উদয় হয়—উহাতে তোমার মনে যত গোলমাল আছে, সব ঠাণ্ডা করিয়া দেয়, উহাতে তোমাকে শান্ত করিয়া দেয়, তোমাকে ক্ষণকালের জন্য একরূপ নশ্বর প্রকৃতির বাহিরে লইয়া যায় ও তোমাকে এক স্বর্গীয় আনন্দের অবস্থায় ফেলিয়া দেয়। এরূপ ভাবের প্রেম আমাদের কথিত ত্রিকোণের এক কোণ। প্রেমের পরিবর্ত্তে কিছু চাহিও না। তুমি যেন কেবল দিয়াই যাইতে থাক। ভগবানকে তোমার প্রেম দাও, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতেও তাহার পরিবর্ত্তে কিছু চাহিও না।

প্রেমরূপ ত্রিকোণের দ্বিতীয় কোণ এই যে, প্রেমে কোন ভয় নাই। যাহারা ভগবানকে ভয়ে ভালবাসে, তাহারা মনুষ্যাধম,

তাহাদের মনুষ্যত্বের এখনও স্ফূর্ত্তি হয় নাই। ইহারা শাস্তির ভয়ে ভগবানকে উপাসনা করে। তাহারা মনে করে, তিনি এক মহান্ পুরুষ, তাঁহার এক হস্তে দণ্ড, এক হস্তে ছত্র; তাঁহার আজ্ঞাপালন না করিলে তাহারা দণ্ডিত হইবে। ভগবানকে দণ্ডের ভয়ে উপাসনা অতি নিম্নদরের উপাসনা। এইরূপ উপাসনাকে যদি উপাসনাই বলিতে হয়, তবে উহা প্রেমধর্ম্মের অতিনিম্নসোপান মাত্র বলিতে হইবে। যতদিন হৃদয়ে কোনরূপ ভয় থাকে, ততদিন প্রেমবিকাশের সম্ভাবনা কোথায়? প্রেম স্বভাবতই সমুদয় ভয়কে নাশ করিয়া ফেলে। মনে ভাবিয়া দেখ, ঐ তরুণী জননী পথে দাঁড়াইয়া; একটা কুক্কুর ডাকিলেই তিনি ভয় পাইয়া সত্বর গৃহে প্রবেশ করেন। কিন্তু যদি তাঁহার শিশু তাঁহার সঙ্গে থাকে ও যদি কোন সিংহ শিশুটীকে আক্রমণ করে, তখন সেই জননী কোথায় থাকিবেন, মনে কর? অবশ্য তখন তিনি সিংহমুখে ধাবমান হইবেন। প্রেম বাস্তবিকই সমুদয় ভয়কে নাশ করিয়া ফেলে। ভয় আসে, কেবল জগৎ হইতে-আপনাকে পৃথক্ করা রূপ স্বার্থপর ভাব হইতে। আমি নিজেকে যত ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর করিয়া ফেলিব, আমার ভয়ও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। যদি কেহ বিবেচনা করে, সে কিছুই নহে, তাহার নিশ্চয়ই ভয় আসিবে। আর তুমি নিজেকে ক্ষুদ্র বলিয়া যত কম ভাবিবে, ততই তোমার ভয় কমিয়া যাইবে। যতদিন তোমাতে একবিন্দুও ভয় আছে, ততদিন তোমাতে প্রেম থাকিতে পারে না। প্রেম ও ভয় দুইটী বিপরীত-ধর্ম্মাত্মক। যাঁহারা ভগবানকে ভাল বাসেন, তাঁহারা তাঁহাকে কখনই ভয় করিবেন না। প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমিক 'ভগবানের নাম বৃথা লইও না,' এই আদেশ শুনিয়া হাস্য করেন।

প্রেমের ধর্ম্মে ভগবন্নিন্দা কিরূপে থাকিতে পারে? যেরূপেই হউক না কেন, তুমি প্রভুর নাম যত লইতে পার, ততই মঙ্গল। তুমি তাঁহাকে ভালবাস, তাই তুমি তাঁহার নাম করিতেছ।

প্রেমত্রিকোণের তৃতীয় কোণটী এই যে, প্রেমিকের আর দ্বিতীয় ভালবাসার পাত্র থাকিবে না, কারণ উহাই প্রেমিকের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হইবে। যতদিন না আমাদের ভালবাসার পাত্র আমাদের নিকট আমাদের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়, ততদিন প্রকৃত প্রেম আসিতে পারে না। হইতে পারে, অনেক স্থলে মানুষের প্রেম অসৎ দিকে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু প্রেমিক লোকের পক্ষে তাহার প্রিয় বস্তুই তাহার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। কোন লোক অতি কুৎসিৎ লোকের ভিতর আপনার উচ্চ আদর্শ দেখিতে পায়, আবার অপরে খুব বড় লোকে ইহা দেখিতে পায়, কিন্তু এই সকল স্থলেই কেবল আদর্শটীকেই প্রকৃত ও তীব্রভাবে ভালবাসা যাইতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির উচ্চতম আদর্শকেই ঈশ্বর বলে। অজ্ঞান হউন, জ্ঞানী হউন, সাধু হউন, পাপী হউন, নর বা নারী, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকল মনুষ্যেরই উচ্চতম আদর্শ ঈশ্বর। সমুদয় সৌন্দর্য্য, মহত্ব ও শক্তির উচ্চতম আদর্শের সমষ্টিই আমাদিগকে প্রেমিক ও তাঁহার প্রেমাস্পদ ঈশ্বরের পূর্ণ ভাব প্রদান করিতে পারে। এই আদর্শ গুলি প্রত্যেক ব্যক্তির মনে কোন না কোন রূপে স্বভাবতই বর্ত্তমান। উহারা যেন, আমাদেরই মনের অংশবিশেষ। মানবপ্রকৃতিতে যে সকল ক্রিয়ার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সকলেই আদর্শগুলিকে ব্যবহারিক জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা-স্বরূপ। আমরা চতুর্দ্দিকে যে নানাবিধ ব্যাপার দেখিতে পাই, তাহা ভিন্ন ভিন্ন আত্মার বিভিন্ন আদর্শকে কার্য্য-ক্ষেত্রে কার্য্যে পরিণত করিবার

চেষ্টার ফলমাত্র। যাহা ভিতরে আছে, তাহাই বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছে। আদর্শের এই মহাপ্রভাবই মানবজাতির মধ্যে নিত্যক্রিয়াশীলসঞ্চালিনী শক্তি। হইতে পারে, শত জন্ম, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া চেষ্টার পর মানুষ বুঝিতে পারে যে, আমাদের অভ্যন্তরস্থ আদর্শ বাহিরের অবস্থা সমূহের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল খাইতে পারে না। এইটী বুঝিতে পারিলে সে বহির্জ্জগৎকে নিজের আদর্শমত গঠন করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আদর্শকে সেই উচ্চতম প্রেমের ভূমি হইতে আদর্শরূপে উপাসনা করে। সমুদয় নিম্নতম আদর্শগুলিই এই পূর্ণ আদর্শের অন্তর্গত। সকলেই এই সত্য স্বীকার করিয়া থাকেন যে, প্রেমিক ইথিওপের জন্তে হেলেনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া থাকে। বাহিরের লোক বলিতে পারে, প্রেম অপাত্রে প্রদত্ত হইতেছে, কিন্তু প্রেমিক ইথিওপের জন্তে হেলেনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া থাকে। হেলেন হউক, ইথিওপ হউক, বস্তুতঃ আমাদের প্রেমের বস্তুগুলি যেন কতকগুলি মধ্যবিন্দু, যাহাদের ভিতরে আমাদের আদর্শগুলি যেন কেন্দ্রীভূত। জগৎ সাধারণতঃ কিসের উপাসনা করে? অবশ্য এই উচ্চতম ভক্ত ও প্রেমিকের সর্ব্বস্পর্শী পূর্ণ আদর্শ নহে। লোকে সাধারণতঃ নিজ হৃদয়াভ্যন্তরীণ আদর্শকেই উপাসনা করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শ বাহিরে প্রক্ষেপ করিয়া তাহারই নিকট জানু অবনত করিয়া প্রণত হয়। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই, যাহারা নিজে নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু, তাহারা কেবল রক্তপিপাসু ঈশ্বরেরই উপাসনা করিতে পারে, কারণ তাহারা কেবল নিজেদের উচ্চতম আদর্শকেই ভাল বাসিতে পারে। এই জন্যই সাধুব্যক্তির ঈশ্বরের আদর্শ অতি উচ্চ, আর তাঁহাদের আদর্শ অপর ব্যক্তির আদর্শ হইতে এতদূর পৃথক্।

প্রেমের ভগবানের প্রমাণ তিনিই।

যে প্রেমিক ব্যক্তি স্বার্থপরতা ও কেনা বেচার ভাবের উপরে
গিয়াছেন, এবং যাঁহার কোন ভয় নাই, তাঁহার আদর্শ কি? মহা
মহিমাময় ঈশ্বরকেও সে ব্যক্তি বলিবে, আমি তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব
দিব, তোমার নিকট হইতে আমি কিছুই চাহি না। বাস্তবিক
এমন কিছুই নাই, যাহা আমি 'আমার' বলিতে পারি। যখন
মানুষ এইরূপ ধারণা-সম্পন্ন হয়, তখন তাহার আদর্শ পূর্ণ
প্রেম-সমন্বিত হইয়া পড়ে; উহা প্রেমজনিত পূর্ণ নির্ভীকতা
রূপে পরিণত হয়। এইরূপ পুরুষের সর্ব্বোচ্চ আদর্শে কোন
রূপ ব্যক্তিগত প্রেমের সঙ্কীর্ণতা নাই। উহা সার্ব্বভৌমিক প্রেম
অনন্ত ও অসীম প্রেম, প্রেমমাত্র বা পূর্ণ প্রেমরূপে পরিণত
হয়। প্রেমধর্ম্মের এই মহান্ আদর্শকে তখন সর্ব্বপ্রকার
অবলম্বন-নিরপেক্ষ হইয়া উপাসনা করা হয়। ইহাই পরা
ভক্তি—সর্ব্বোচ্চ অবস্থা—একটী সার্ব্বভৌমিক আদর্শকে আদর্শ
বলিয়া উপাসনা করা। অন্য সকল প্রকার ভক্তি কেবল এই
ভক্তিতে পঁহুছিবার সোপান মাত্র। এই প্রেমধর্ম্মের চরম
আদর্শে পঁহুছিতে আমরা যে পথে কখনও বেশ সফলতার
সহিত অগ্রসর হই, আবার কখন যে পদস্খলন হয়, তাহা
সকল গুলিই সেই চরম লক্ষ্যে গমনের সহায়ক, বুঝিতে হইবে।
এক একটী বস্তু গৃহীত হইল ও আমাদের অন্তস্তরবর্ত্তী আদর্শ
উহার উপর একে একে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। ক্রমে
এই সমুদয় বাহ্য বস্তুই ক্রমবিসর্পী এই আভ্যন্তরীণ আদর্শের
প্রকাশকের পক্ষে অনুপযুক্ত বোধ হইতে লাগিল ও স্বভাবতঃ
একটীর পর আর একটী পরিত্যক্ত হইতে লাগিল। অবশেষে

সেই সাধক বুঝিতে থাকেন যে, বাহ্য বস্তুতে আদর্শকে অনুভব করিবার চেষ্টা বৃথা। আদর্শের সহিত তুলনায় এই সকল বাহ্য বস্তুই অতি তুচ্ছ। আর কালে তিনি সেই সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্ববস্তুর মধ্যে সাধারণ ভাবে অবস্থিত সেই অণোরণীয়ান্ আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে অন্তরেই অনুভব করিতে পারেন। তাহাই তাঁহার নিকট প্রকৃত জীবন্ত ও সত্য হইয়া দাঁড়ায়। যখন ভক্ত এই অবস্থা লাভ করেন, তখন ভগবানকে প্রমাণ করা যায় কি না, এরূপ প্রশ্ন তাঁহার মনে উদয়ই হয় না। তাঁহার নিকট তিনি কেবল প্রেমের ভগবানমাত্র। তিনি প্রেমের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ—ইহাই পর্য্যাপ্ত। তাঁহার প্রেমস্বরূপতা স্বতঃসিদ্ধ, অন্য-প্রমাণ-নিরপেক্ষ। প্রেমিকের নিকট প্রেমময়ের অস্তিত্ব প্রমাণের কিছু মাত্র আবশ্যক নাই। অন্যান্য ধর্ম্মের বিচারক ভগবান প্রমাণ করিতে অনেক প্রমাণের আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু ভক্তের এরূপ ভগবানে কিছু প্রয়োজনবোধই থাকে না। তাহার নিকট ভগবান কেবল মাত্র প্রেমরূপ। "কেহই পতিকে পতির জন্য ভালবাসে না, পতির অন্তর্ব্বর্ত্তী আত্মার জন্যই লোকে পতিকে ভালবাসে। কেহই পত্নীকে পত্নীর জন্য ভালবাসে না, পত্নীর অন্তর্ব্বর্ত্তী আত্মার জন্যই লোকে পত্নীকে ভালবাসে।" কেহ কেহ বলেন, মানুষের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের মূল স্বার্থপরতা। উহাও প্রেম, তবে বিশিষ্টতা হেতু নিম্নভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে মাত্র। যখন আমি আমাকে সর্ব্বব্যাপী ভাবি, তখন নিশ্চয়ই আমাতে স্বার্থপরতা থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন আমি ভ্রম বশতঃ নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করি, তখন আমার প্রেম সঙ্কীর্ণ ভাব ধারণ করে। এই জগতের সকল বস্তুই ভগবৎ-প্রসূত, সুতরাং প্রেমের যোগ্য। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সমষ্টিকে

ভালবাসিদিগেই অংশকে ভালবাসা হইল। এই সমষ্টিই ভক্তের ভগবান। আর অন্যান্য প্রকারের ঈশ্বর, স্বর্গস্থপিতা, শাস্তা স্রষ্টা প্রভৃতি, সমুদয় মতামত, শাস্ত্র প্রভৃতি, ভক্তের নিকট ইহাদের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই; কারণ তাঁহারা পরা ভক্তির প্রভাবে একেবারে এই সকলের উপরে চলিয়া গিয়াছেন। যখন অন্তর শুদ্ধ ও পবিত্র এবং স্বর্গীয় প্রেমামৃতে পূর্ণ হয়, তখন অন্য সকল প্রকার ঈশ্বরের ভাব বালকের যোগ্য ও অসম্পূর্ণ বা অনুপযুক্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। পরাভক্তির প্রভাবই এইরূপ। তখন সেই উচ্চাবস্থাপন্ন ভক্ত তাঁহার ভগবানকে মন্দিরাদিতে অন্বেষণ করিতে যান না; তিনি এমন স্থানই দেখিতে পান না, যেখানে তিনি নাই। তিনি তাঁহাকে মন্দিরের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র দেখিতে পান। তিনি তাঁহাকে সাধুর সাধুতায় ও পাপীর পাপে দেখিতে পান। ইহার কারণ, তিনি পূর্ব্বেই তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান, অনির্ব্বাণ, নিত্যদীপ্তিমান ও নিত্যবর্ত্তমান প্রেমজ্যোতিরূপে দেখিতে পাইয়াছেন।

মানবীয় ভাষায় ভগবৎ-প্রেমের বর্ণনা।

মানবীয় ভাষায় প্রেমের এই পরমোচ্চ আদর্শ প্রকাশ করা অসম্ভব। খুব উচ্চ মানবকল্পনাও উহার অনন্ত পূর্ণতা ও সৌন্দর্য্য অনুভবে অক্ষম। তথাপি সর্ব্বদেশের প্রেমধর্ম্মের নিম্নউচ্চ উভয় অবস্থার উপাসকগণকে তাঁহাদের প্রেমের আদর্শ অনুভব করিতে ও উহার সংজ্ঞা করিতে বরাবরই এই অনুপযোগী মানবীয় ভাষা

ব্যবহার করিতে হইয়াছে। শুধু ইহাই নহে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মানবীয় প্রেমই এই অব্যক্ত ভগবৎ-প্রেমের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। মানুষ আধ্যাত্মিক বিষয় সমূহ নিজের মানবীয় ভাবেই প্রকাশ করিতে পারে, পূর্ণ কেবলমাত্র আমাদের আপেক্ষিক ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে। সমুদয় জগৎ আমাদের নিকট আর কি? অনন্ত—সান্ত ভাষায় লিখিত মাত্র। এই কারণেই ভক্তেরা ভগবান ও তাঁহার প্রেমের উপাসনা বিষয়ে লৌকিক প্রেমের লৌকিক শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়া থাকেন। পরাভক্তির কয়েকজন ব্যাখ্যাতা এর পরাভক্তি কয়েকটী বিভিন্ন উপায়ে বুঝিতে ও প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে সর্ব নিম্নতম অবস্থাকে শান্ত ভক্তি বলে। যখন মানুষের হৃদয়ে প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত হয় নাই, যখন তাহার মস্তিষ্ক প্রেমের উন্মত্ততায় আত্মহারা হয় নাই, এই বাহ্য ক্রিয়াকলাপ বাহ্য ভক্তি হইতে একটু উন্নত সাদাসিদে রকম প্রেম উদয় হইয়াছে মাত্র, যখন উহা অবিকাশশীল প্রেমের উন্মত্ততা-লক্ষণে লক্ষিত নহে, তখন উহাকে শান্ত বলে। দেখিতে পাই, জগতে কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা ধীরে ধীরে সাধনপথে অগ্রসর হন। আর কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা ঝড়ের মত বেগে চলিয়া যান। শান্ত ভক্ত ধীর, শান্ত, নম্র। তদপেক্ষা একটু উচ্চ অবস্থা—দাস্য। এ অবস্থায় মানুষ আপনাকে ঈশ্বরের দাস ভাবে। বিশ্বাসী ভৃত্যের প্রভুভক্তিই তাঁহার আদর্শ।

তার পর সখ্য প্রেম—"তুমি আমার প্রিয় বন্ধু।" যেমন মানুষ বন্ধুর নিকট আপনার হৃদয় খোলে, জানে যে, বন্ধু তাহার দোষের জন্য তাহাকে তিরস্কার না করিয়া যাহাতে তাহার হিত হয়, তাহার চেষ্টা করিবে—বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে যেমন একটা সমান সমান ভাব

থাকে, তদ্রূপ সাধক ও তাঁহার সখাস্বরূপ ভগবানের মধ্যে যেন এক রকম সমান সমান ভাব। সুতরাং ভগবান আমাদের হৃদয়ের অতি সন্নিহিত বন্ধু হইলেন—সেই বন্ধুর নিকট আমরা আমাদের জীবনের সব কথা খুলিয়া বলিতে পারি—আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশের গুপ্তভাব সকল তাঁহার নিকট জানাইতে পারি। সম্পূর্ণ ভরসা আছে যে, তিনি যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয়, তাই করিবেন। এই ভাবিয়া আমরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এ অবস্থায় ভক্ত ভগবানকে তাঁহার সমান মনে করেন—ভগবান যেন আমাদের খেলুড়ে। আমরা সকলে যেন এই জগতে খেলা করিতেছি। যেমন ছেলেরা খেলা করে, যেমন বড় বড় শ্রীল শ্রীযুক্ত নরপতিরাও আপনাদের খেলা খেলিয়া যান, সেই রূপেই সেই প্রেমিক প্রভুও নিজে জগতের সহিত খেলা করিতেছেন। তিনি পূর্ণ—তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। তাঁহার সৃষ্টি করিবার আবশ্যক কি? কার্য্য আমরা করি—উদ্দেশ্য কোন অভাবপূরণ। আর অভাব বলিতেই অসম্পূর্ণতা বুঝায়। ভগবান পূর্ণ—তাঁহার কোন অভাব নাই। কেন তিনি এই নিয়ত কর্ম্মময় সৃষ্টি লইয়া ব্যস্ত থাকেন? তাঁহার কি উদ্দেশ্য? ভগবানের সৃষ্টির অভিপ্রায় বিষয়ে যে সকল গল্প শুনা যায়, সে গুলি অবশ্য গল্পহিসাবে সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু উহাদের অন্য কোন মূল্য নাই। বাস্তবিক সবই তাঁর খেলা। এই জগৎ তাঁহার খেলা—ক্রমাগত এই খেলা চলিতেছে। তাঁহার পক্ষে সমুদয় জগৎটা একটা মজার খেলা মাত্র। যদি তুমি খুব নিঃস্ব হও, তবে সেই নিঃস্বতাকেই একটা মহা তামাসা বলিয়া বিবেচনা কর—বড় মানুষ হও ত, ঐ বড়মানুষত্বকেই তামাসারূপে সম্ভোগ কর। বিপদ আসে ত, তাহাই সুন্দর তামাসা, আবার

সুখ পাইলে মনে করিতে হইবে, এও এক সুন্দর তামাসা। জগৎ কেবলমাত্র ক্রীড়াক্ষেত্র—আমরা এখানে বেশ নানারূপে তামাসা—মজা উড়াইতেছি—যেন খেলা হইতেছে, আর ভগবান আমাদের সহিত সর্ব্বদাই খেলা করিতেছেন, আমরাও তাঁহার সহিত খেলিতেছি। ভগবান আমাদের অনন্তকালের খেলুড়ে—অনন্তকালের খেলার সঙ্গী। কেমন সুন্দর খেলা করিতেছেন! খেলা সাঙ্গ হইল—এক যুগ শেষ হইল। তার পর অল্পাধিক সময়ের জন্য সব বিশ্রাম—তার পর আবার বাহিরে আসিয়া খেলা। কেবল যখন ভুলিয়া যাও, সবই খেলা, আর তুমিও এ খেলায় সহায়ক, তখনই, কেবল তখনই দুঃখ কষ্ট আইসে। তখনই হৃদয় গুরুভারাপন্ন হয়, আর সংসার তোমার উপর গুরুবিক্রমে চাপিয়া বসে। কিন্তু যখনই তুমি এই দুদণ্ড জীবনের পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাবলীতে সত্যবোধ ত্যাগ কর, আর যখন সংসারকে ক্রীড়াবঙ্গভূমি ও আপনাদিগকে তাঁহার ক্রীড়াসহায়ক বলিয়া মনে কর তৎক্ষণাৎ দুঃখ চলিয়া যায়। প্রতি অণুতে তিনি খেলা করিতেছেন। তিনি খেলা করিতে করিতে পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেছেন। তিনি মনুষ্যহৃদয়, প্রাণী ও উদ্ভিদসমূহে ক্রীড়া করিতেছেন। আমরা তাঁহার শতরঞ্চ-খেলার খেলুড়ে। তিনি ঐ খেলুড়েগণকে যেন একটী ক্রীড়াফলকে রাখিয়া নাড়িতেছেন। তিনি প্রথমে একদিকে, পরে অপরদিকে সাজাইতেছেন—আমরাও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতভাবে তাঁহারই ক্রীড়ায় সহায়ক। কি আনন্দ! আমরা তাঁহার ক্রীড়াসহায়ক!

তার পরের অবস্থাকে বাৎসল্য প্রেম বলে। উহাতে ভগবানকে পিতা না ভাবিয়া সন্তান ভাবিতে হয়। এটী কিছু নূতন রকমের বোধ হইতে পারে, কিন্তু উহার উদ্দেশ্য—

আমাদের ভগবানের ধারণা হইতে ঐশ্বর্য্যের ভাবগুলি সব দূর করা। ঐশ্বর্য্যভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভয় আইসে। কিন্তু ভালবাসার ভয় থাকা উচিত নয়। চরিত্র গঠনের জন্য ভক্তি ও আজ্ঞাবহতা অভ্যাসের আবশ্যক বটে, কিন্তু একবার চরিত্র গঠিত হইলে—যখন প্রেমিক, শান্ত-প্রেমের একটু আস্বাদ করেন, আবার প্রেমের তীব্র উন্মত্ততাও কিছু আস্বাদ করেন, তখন তাঁহার আর নীতিপালন, সাধন নিয়ম, এ সকলগুলির কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। প্রেমিক বলেন, ভগবানকে মহামহিম, ঐশ্বর্য্যশালী, জগন্নাথ, দেবদেবরূপে ভাবিতে আমার ইচ্ছা হয় না! ভগবানের ধারণা হইতে এই ভয়োৎপাদক ঐশ্বর্য্যভাব তাড়াইবার জন্য তিনি ভগবান্‌কে সন্তানরূপে ভাল বাসেন। মা বাপ ছেলের কাছে ভয় পায় না, ছেলের প্রতি তাদের ভক্তিও হয় না। তাহাদের ছেলের কাছে কিছু প্রার্থনা করিবারও থাকে না। ছেলেরই সর্ব্বদা পাওনারই দাবী। সন্তানের প্রতি ভালবাসার জন্য বাপ মা শতশত বার শরীরত্যাগে প্রস্তুত। তাহাদের এক সন্তানের জন্য তাহারা সহস্র জীবন উৎসর্গে প্রস্তুত। এই ভাব হইতেই ভগবান্‌কে বাৎসল্যভাবে ভালবাসা হয়। যে সকল সম্প্রদায় ভগবান্ অবতার হন, বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যেই এই বাৎসল্যভাবে উপাসনা স্বাভাবিক। মুসলমানদের পক্ষে ভগবানকে এইরূপে সন্তানভাবে ভাবা মহা কঠিন। তারা ভয়ে এভাব হইতে তফাতে থাকিবে। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান ও হিন্দু সহজেই ইহা বুঝিতে পারে, কারণ তাঁহাদের বালক যীশু, বালকৃষ্ণ রহিয়াছেন। ভারতের স্ত্রীলোকেরা অনেক সময়ে আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের মাতা বলিয়া চিন্তা করেন। খ্রীষ্টিয়ান জননীগণও আপনাদিগকে খ্রীষ্টের মাতা

বলিয়া চিন্তা করিতে পারেন। ইহা হইতে পাশ্চাত্য প্রদেশে ঈশ্বরের মাতৃভাবের জ্ঞান আসিবে—ইহা তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন। এই ভগবানের প্রতি ভয়ভক্তিরূপ কুসংস্কার আমাদের অন্তরের অন্তরে দৃঢ়মূল হইয়া আছে। ভগবৎসম্বন্ধীয় এই ভয়ভক্তিঐশ্বর্য্যমহিমার ভাব এই প্রেমের ভিতর একেবারে নিমজ্জিত করিয়া দিতে অনেক দিন লাগে।

মানুষে প্রেমের এই স্বর্গীয় আদর্শকে আর একরূপে প্রকাশ করিয়াছে। উহার নাম মধুর—উহাই সর্ব্বপ্রকার প্রেমের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। জগতের সর্ব্বোচ্চ প্রেমের উপর উহা স্থাপিত—আর মানবীয় প্রেমের মধ্যে উহাই সর্ব্বোচ্চ। স্ত্রীপুরুষের প্রেম যেরূপ মানুষের সমুদয় প্রকৃতিটাকে ওলট পালট করিয়া ফেলে, আর কোন্ প্রেম সেরূপ করিতে পারে? কোন্ প্রেম লোকের প্রতি পরমাণুর মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলে—নিজের প্রকৃতি ভুলাইয়া দেয়—মানুষকে হয় দেবতা নয় পশু করিয়া দেয়? এই মধুর প্রেমে ভগবান্‌কে আমাদের পতিরূপে চিন্তা করা হয়। আমরা সকলে স্ত্রী। জগতে আর পুরুষ নাই। কেবল একমাত্র পুরুষ আছেন—তিনিই, আমাদের সেই প্রেমাস্পদই একমাত্র পুরুষ। পুরুষের প্রতি স্ত্রীর ও স্ত্রীর প্রতি পুরুষের এই ভালবাসা ভগবান্‌কে অর্পণ করিতে হইবে। আমরা জগতে যত প্রকার প্রেম দেখিতে পাই, যাহা লইয়া আমরা অল্লাধিক পরিমাণে খেলা করিতেছি মাত্র, ভগবান্‌ই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। তবে হতভাগ্য লোক—যে অনন্ত সমুদ্রে মহান্ প্রেমের নদী সদা প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকে জানে না, সুতরাং নির্ব্বোধের ন্যায় সে মানুষরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুতুলের প্রতি উহা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে। মধুর

প্রকৃতিতে সন্তানের প্রতি যে প্রবল স্নেহ দেখা যায়, তাহা কেবল একটী সন্তানরূপ ক্ষুদ্র পুতুলের জন্য নহে। যদি তুমি অন্ধভাবে ও একমাত্র সন্তানের উপর উহাকে প্রয়োগ কর, তুমি তজ্জন্য বিশেষ ভোগ করিবে। কিন্তু ঐ ভোগ হইতেই তোমার এই বোধ আসিবে যে, তোমার ভিতরে যে প্রেম আছে, তাহা যদি কোন মনুষ্যে প্রয়োগ কর, তবে শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক, অশান্তি আনয়ন করিবে। সুতরাং আমাদের প্রেম সেই পুরুষোত্তমের উপর প্রয়োগ করিতে হইবে—যাঁহার বিনাশ নাই, যাঁহার কখন কোন পরিবর্ত্তন নাই, যাঁহার প্রেম সমুদ্রে জোয়ারভাঁটা নাই। প্রেম যেন তাহার প্রকৃত লক্ষ্যে পঁহছে, যেন উহা সেই প্রেমের অনন্ত সমুদ্রে পঁহুছে। সকল নদীই সমুদ্রে পঁহুছে। একটী জলবিন্দু পর্য্যন্ত পর্ব্বতগাত্র হইতে পতিত হইয়া কেবল একটী নদীতে (উহা যত বড়ই হউক না কেন) থামিতে পারে না। অবশেষে সেই জলবিন্দু কোন না কোনরূপে সমুদ্রে প্রবেশ করে। ভগবান্ আমাদের সর্ব্ব প্রকার ভাবের একমাত্র লক্ষ্য। যদি রাগিতে চাও, ভগবানের প্রতি রাগ কর। তোমার প্রেমাস্পদকে ধমকাও—তোমার সখাকে ধমকাও। আর কাহাকে তুমি নির্ভয়ে তিরস্কার করিতে পার? মর্ত্ত্য জীব তো তোমার রাগ সহ্য করিবে না। তাহাতে তোমার উপর প্রতিক্রিয়া আসিবে। যদি তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হও, আমি অবশ্যই তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিব, কারণ আমি তোমার রাগ সহ্য করিতে পারিব না। তোমার প্রেমাস্পদকে বল, তুমি আমার কাছে কেন আসিতেছ না? কেন আমাকে একলা ফেলিয়া রাখিয়াছ? তাহাতে ব্যতীত আর কিসে আনন্দ আছে? ছোট ছোট সংসারের পুতুলে কি সুখ আছে?

অনন্ত আনন্দের জমাটকেই আমাদিগকে অন্বেষণ করিতে হইবে—ভগবানই এই আনন্দের জমাটবাঁধা। আমাদের প্রবৃত্তি আদি সবই যেন তাঁহার সমীপে যায়। উহা তাঁহারই জন্য অভিপ্রেত। উহারা যদি লক্ষ্যের নীচে চলিয়া যায়, তবে উহারা জুগুপ্সিতরূপ ধারণ করিবে। যখন তাহারা ঠিক তাহাদের লক্ষ্য স্থলে পঁহুছায়, তখন অতি নিম্নতম বৃত্তি পর্য্যন্ত অন্যরূপ ধারণ করে। মানুষের মন ও শরীরের সমুদয় শক্তি—তাহারা যে ভাবেই প্রকাশিত থাকুক না কেন, ভগবানই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য—একায়ণ। মনুষ্যহৃদয়ের সব ভালবাসা—সব প্রবৃত্তি যেন ভগবানের দিকে যায়। তিনিই প্রেমের যোগ্য। এই মনুষ্যহৃদয় আর কাহাকে ভাল বাসিবে? তিনি পরম সুন্দর, পরম মহৎ—সৌন্দর্য্য-স্বরূপ, মহত্ত্বস্বরূপ। তাঁহা অপেক্ষা জগতে আর সুন্দর কে আছে? তিনি ব্যতীত জগতে আর স্বামী হইবার উপযুক্ত কে? জগতে ভালবাসার উপযুক্ত আর কে আছেন? অতএব, তিনিই যেন আমাদের স্বামী হয়েন, তিনিই যেন আমাদের প্রিয়তম প্রেমাস্পদ হয়েন। অনেক সময়ে এরূপ ঘটে যে, ভগবদ্ভক্তগণ এই ভগবৎ-প্রেমের বিষয় বলিতে গিয়া সর্ব্বপ্রকার মানবীয় প্রেমের ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। মূর্খেরা ইহা বুঝে না—তাহারা কখনও ইহা বুঝিবে না। তাহারা উহা কেবল জড়দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। তাহারা এই আধ্যাত্মিক প্রেমোন্মত্ততা বুঝিতে পারে না। কেমন করিয়া বুঝিবে? "হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটীমাত্র চুম্বন, যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, তাহার তোমার জন্য পিপাসা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়। তিনি তোমা ব্যতীত আর সব ভুলিয়া যান।" * প্রিয়তমের

---

* সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতং।

সেই চুম্বন—তাঁহার অধরের সহিত সেই সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুল হও—যাহাতে ভক্তকে পাগল করিয়া দেয়, যাহা তাঁহাকে দেবতা করিয়া তুলে। ভগবান্ যাঁহাকে একবার তাঁহার অধরামৃত দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তাঁহার সমুদয় প্রকৃতিই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাঁহার পক্ষে জগৎ উড়িয়া যায়—তাঁহার পক্ষে সূর্য্য চন্দ্রের আর অস্তিত্ব থাকে না—জগৎও এক অনন্ত প্রেমের সমুদ্রে পরিণত হইয়া যায়। ইহাই প্রেমোন্মত্ততার চরমাবস্থা। প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমিক আবার ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। স্বামীস্ত্রীর প্রেমও তাঁহার নিকট তত উন্মাদকর নহে। ভক্তেরা অবৈধ (পরকীয়) প্রেমের ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন, কারণ উহা অতিশয় প্রবল। উহার অবৈধতা তাঁহাদের লক্ষ্য নহে। এই প্রেমের প্রকৃতি এই যে, যতই উহা বাধা পায়, ততই উহা উগ্রভাব ধারণ করে। স্বামীস্ত্রীর ভালবাসা অবাধ—উহাতে কোন বাধা-বিঘ্ন নাই। সেই জন্য ভক্তেরা কল্পনা করেন, যেন কোন বালিকা তাঁহার প্রিয়তম পুরুষে আসক্ত, আর তাঁহার পিতা, মাতা বা স্বামী ঐ প্রেমের বিরোধী। যতই ঐ প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হয়, ততই উহা প্রবলভাব ধারণ করিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে কিরূপে লীলা করিতেন; কিরূপে সকলে তাঁহাকে উন্মত্ত হইয়া ভালবাসিত, কিরূপে তাঁহার সাড়া পাইবামাত্র গোপীরা—সেই ভাগ্যবতী গোপীরা সমুদয় ভুলিয়া, জগৎ ভুলিয়া, জগতের সব বন্ধন, জাগতিক কর্ত্তব্য,—ইহার সমুদয় সুখ দুঃখ ভুলিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, মানবীয় ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। মানুষ—

ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥
শ্রীমদ্ভাগবত। ১০ম স্কন্ধ। ৩১শ অধ্যায়। ১৪শ শ্লোক।

মানুষ, তুমি ঐশ্বরিক প্রেমের কথা কও, আবার জগতের সব ভ্রমাত্মক বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতেও পার! তোমার কি মন মুখ এক? 'যেখানে রাম আছেন, সেখানে কাম থাকিতে পারে না। যেখানে কাম, সেখানে রাম থাকিতে পারেন না।' * উহারা কখন একত্রে থাকে না, আলো আঁধার কখন একসঙ্গে থাকে না।

উপসংহার।

যখন প্রেমের এই উচ্চতম আদর্শে উপনীত হওয়া যায়, তখন জ্ঞান কোথায় চলিয়া যায়! কে আর তখন জ্ঞানের জন্য ব্যস্ত হইবে? মুক্তি, উদ্ধার হওয়া, নির্ব্বাণ এ সবই তখন কোথায় চলিয়া যায়। এই ঈশ্বর-প্রেম সম্ভোগ করিতে পাইলে কে মুক্ত হইতে চাহে? "ভগবন্, আমি ধন, জন, সৌন্দর্য্য, বিদ্যা, এমন কি মুক্তি পর্য্যন্ত চাহি না। জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার অহেতুকী ভক্তি থাকে।" ভক্ত বলেন, 'চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভাল বাসি।' তখন কে মুক্ত হইবে? কে ভগবানের সহিত অভেদভাব আকাঙ্ক্ষা করিবে? ভক্ত বলেন, আমি জানি, তিনি ও আমি এক, কিন্তু তথাপি আমি তাঁহা হইতে আমাকে পৃথক্ রাখিয়া প্রিয়তমকে সম্ভোগ করিব। প্রেমের জন্য প্রেম—ইহাই তাঁহার সর্ব্বোচ্চ সুখ। প্রিয়তমকে সম্ভোগ করিবার জন্য কে না সহস্রবার বদ্ধ হইবে? কোন ভক্তই প্রেম ব্যতীত অন্য কোন

---

* যাঁহা রাম তাঁহা কাম নহি, যাঁহা কাম তাঁহা নহি রাম।

তুলসীকৃত দোঁহা।

বস্তু কামনা করেন না। তিনি কেবল ভালবাসিতে চান—ইহাই তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা। তাঁহার নিষ্কাম প্রেম যেন উজান বাহিয়া যাওয়া। প্রেমিক যেন নদীর উৎপত্তিস্থানের দিকে স্রোতের বিপরীতে যান। জগৎ তাঁহাকে পাগল বলে। আমি জানি, কোন ব্যক্তিকে লোকে পাগল বলিত। তিনি উত্তর দিতেন, "বন্ধুগণ, সমুদয় জগৎ একটী বাতুলালয়। কেহ সাংসারিক প্রেম লইয়া উন্মত্ত। কেহ নামের জন্য, কেহ যশের জন্য, কেহ অর্থের জন্য, আবার কেহ বা মুক্তি বা স্বর্গের জন্য উন্মত্ত। এই বিরাট বাতুলালয়ে আমিও বাতুল। আমি ভগবানের জন্য পাগল। তুমি পাগল, আমিও তাহাই। আমার বোধ হয়, আমার পাগলামিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।" প্রকৃত ভক্তের এই জলন্ত প্রেমের সম্মুখে আর সবই উড়িয়া যায়। সমুদয় জগৎ তাঁহার নিকট প্রেম—কেবল প্রেমে পূর্ণ—প্রেমিকের চক্ষে, এইরূপই প্রতীয়মান হয়। যখন মানুষের ভিতর এই প্রেম প্রবেশ করে, তখন তিনি অনন্তকালের জন্য সুখী, অনন্তকালের জন্য মুক্ত হইয়া যান। ভগবৎপ্রেমের এই উন্মত্ততাই কেবল আমাদের অন্তরস্থ সংসারব্যাধি অনন্তকালের জন্য আরোগ্য করিতে পারে।

প্রেমের ধর্ম্মে আমাদিগকে দ্বৈতবাদিভাবে আরম্ভ করিতে হয়। ভগবান্ যেন একটী পৃথক্ জিনিষ—আমরাও যেন তাঁহা হইতে পৃথক্। প্রেম উহার মধ্যে আসিয়া উভয়ের মিলন সম্পাদন করে। মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ভগবানও মানুষের ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে থাকেন। মানুষ সংসারের সব সম্বন্ধ—যেমন পিতা, মাতা, পুত্র, সখা, প্রভু, প্রণয়ী প্রভৃতি ভাব লইয়া তাঁহার প্রেমের আদর্শ ভগবানের প্রতি আরোপ করিতে থাকেন। তাঁহার নিকট ভগবান্ এই সর্ব্বপ্রকাররূপেই

াজিত। তিনি তখনই উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হন, ন তিনি নিজ উপাস্যদেবতাতে একেবারে নিমগ্ন হইয়া যান। মরা সকলেই নিজেদের ভালবাসি। এই ক্ষুদ্র অহংএর ভাব প্রেমকেও স্বার্থযুক্ত করিয়া তুলে। অবশেষে যখন পূর্ণজ্ঞান-জ্যোতির বিকাশ হয়, তখন এই ক্ষুদ্র অহং যেন সেই অনন্তের সহিত কীভূত হইয়া যায়। মানুষ স্বয়ং এই প্রেমজ্যোতির সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যান। তাঁহার তখন যে সকল মলা ও বাসনা ছিল, সব চলিয়া যায়। তিনি অবশেষে এই সুন্দর প্রাণমাতানো সত্য অনুভব করেন যে, প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমের উপাস্য দেবতা একই।